বাঙলা-সাঁওতালী ভাষা-সম্পর্ক

ক্ষুদিরাম দাস

আচার্য ক্ষুদিরাম দাস জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে নিবেদন-

আচার্য ক্ষুদিরাম দাসের নিরলস গবেষণায় কেবল রবীন্দ্র মনীষা, বা বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের সারাৎসার বা ইতিহাস-মনস্কতাই ধরা পড়েনি, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অধিকার প্রগাঢ়। সাঁওতালী বাংলা সমশব্দ অভিধান তাঁর ভাষাতত্ত্বচর্চা, বিশেষত সাঁওতালী ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষনের একটি সার্থক পরিচয়। তাঁর নিজের সাঁওতালী ভাষাচর্চা বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধের সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে তার গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তাঁর সাঁওতালী ভাষাচর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন গুণগ্রাহীর কয়েকটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরছি।

ভাষাবিজ্ঞানে অনুরাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্যঃ-

কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক-বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন-আমি মুখ্যভাবে কবিকল্পলোক ও কাব্য নির্মণের প্রদর্শক হয়ে রসহীন ভাষাতত্ত্বমূলক অভিধান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি কিভাবে-এর জবাবে এই প্রসঙ্গেই তাঁদের জানাই যে ভাষাবিজ্ঞানে আমার আকর্ষণ ছাত্রাবস্থা থেকেই।কাব্যশাস্ত্রে বরংচ

একটু পরে। ছাত্রাবস্থা থেকে আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে পারদর্শী, সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানেও। কিন্তু তখন এ নিয়ে গবেষণার সুযোগ মেলেনি। ফলে গভীরভাবে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বই লিখে যাই বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরম্ভ করে। কাব্য কলা নিয়ে আমার যাবতীয় নোতুন বক্তব্য শেষ করার পর ভাষাবিজ্ঞানে অনুরাগ, যা সুপ্ত হয়ে ছিল, তা জাগ্রত হয়। বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সহ অর্থ নির্ণয়ের অভিধানটি বাধ্য হয়ে ইংরেজিতেই লিখতে হয়েছে, বিশেষে অবাঙালীদের বাঙলার সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। তারপর আমি শিষ্ট চলিত বাঙলায় তথা পশ্চিমবঙ্গবাসী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের লোকমুখে এমন প্রচুর চলিত শব্দের ব্যবহার শুনি, যেগুলি সংস্কৃতমূলে টেনে নেওয়া যায় না, অর্থাৎ যেগুলি কোল-মুণ্ডা গোত্রের বা সাঁওতালী। অথচ এ নিয়ে বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানে তেমন কোনও আলোচনা নজরে পড়েনি। ফলে এই নোতুন ব্যাপারের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে সাঁওতালী বাঙলার আদান-প্রদান সম্পর্ক বিষয়ে একটি ছোট অভিধানের মত কিছু লিখতেই হয়েছে।বই দু'টি এখনও মুদ্রণের অপেক্ষায়। এই সঙ্গে মনে করে নেবেন যে রবীন্দ্র বিষয়ক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাকে মহাকাশবিজ্ঞান বা astrophysics-এর রাজ্যেও বিচরণ করতে হয়েছে।আর শিক্ষার প্রয়োজনে লিখতে হয়েছে ব্যাকরণের বইও।

ক্ষুদিরাম দাস

সশ্রদ্ধং প্রতিবচনম্

(পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস)

মানুষ ক্ষুদিরাম

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যে বিখ্যাত। যেমন সংস্কৃত তেমনি বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর অসীম অধিকার। তার চেয়েও প্রশংসনীয় লিখনশৈলী ও শব্দচয়ন।আমি তাঁর বাংলা রচনার পক্ষপাতী পাঠক। তার চেয়েও প্রশংসনীয় তাঁর মুক্ত মন। সংস্কারমুক্ত মনে তিনি ভারতের বিবিধ ভাষা অনুশীলন করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দ এসেছে সাঁওতালী ভাষা থেকে। যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সংস্কৃত দিয়ে শোধন করে মুখে তুলেছেন। বাংলাদেশ গোড়ায় ছিল আদিবাসীদের দেশ।তাদের ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণ সূত্রেই বাংলা ভাষার বিবর্তন ঘটেছে। ক্ষুদিরামবাবু সেই বিবর্তনের সন্ধান দিয়ে আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

(বাঁকুড়া লোক

সংস্কৃতি , ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সংখ্যা)

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস আশি বছরে পৌঁছালেন

" ইদানীং সাঁওতালি ভাষা নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বাংলা ভাষার মূলে যে নিষাদ কিরাতের ভাষা দিব্য আসর জমিয়ে বসে আছে, তা তাঁর পূর্বে আমরা ততটা বুঝতে পারিনি। কারণ আর্যবতংসেরা কোল্লভীল্লদের নিকট-আত্মীয় তা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয়, মনু-পরাশরের উত্তরীয়ের খুঁট ধরে কোনো প্রকারে আর্যামির গৌরব রক্ষা করতে চাই, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব নামক দাস-দস্যু-ব্রাত্যসম্প্রদায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।বাংলা ভাষার ধাত্রী কে, বা কে কে। বৈদিক, সংস্কৃত, পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ- "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। বাংলায় শব্দভান্ডার যে নৈকষ্যকুলীন ভঙ্গ-বংশজে আসর জমিয়ে বসে আছে তা নয়। অধিকাংশ শব্দের যজ্ঞোপবীত নেই, কোনো সংস্কারই নেই, কী বৈদিক, আর কী পৌরাণিক। একটু-আধটু তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন-ভজন সংক্রান্ত শব্দ থাকতে পারে-যা সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থ, আউল-বাউলের সাধনভজনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মধ্যে আত্মগোপন করে দিব্য বসবাস করছে, কে তাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তা হলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় ভাষা-খনিত্র দিয়ে সেই ব্রাত্যবৃষলের নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার করছেন। বার্ধক্যেও তিনি প্রায় একহাতে সেই অভিধান প্রণয়ন করেছেন, যা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে"।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস)

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

আমাদের দেশে অশীতি বছর স্পর্শ করে কোন সাহিত্যিক ও পণ্ডিত যে সক্রিয় থেকে সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম যেন তা মনে হয় এক অভাবনীয় ঘটনা। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় বর্তমানে সেই বিরল মানুষের একজন। স্ববিশ্বাসে সাহিত্য ও শব্দকোষ রচনা যাঁর এক দুঃসাধ্য ব্রত। অতি আনন্দের কথা যে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য রচনা ব্যতীত, বিভিন্ন ভাষায় শব্দকোষ রচনা এবং বিশেষ করে সাঁওতালি ভাষায় শব্দকোষ রচনা সমাপ্ত করেছেন এটা আমার নিকট খুবই আশ্চর্য্য মনে হয়। তাঁর ভাষাজ্ঞানের কোন তুলনা নেই। তারপর সাঁওতালি ভাষায় শব্দকোষ রচনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার।তিনি একদিকে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ববিদ।যদিও আমি সাঁওতালি সমাজের সঙ্গে জড়িত আছি, আজ পর্যন্ত তাঁদের ভাষা ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারিনি। শব্দকোষ রচনা করা তো দূরের ব্যাপার। সেদিক থেকে তাঁর এই অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। তাঁর বৃদ্ধ বয়সকে জয় করে এই অসাধারণ সাঁওতালি শব্দকোষ রচনার অবদান

সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের এবং বিশেষত প্রবীণ সাহিত্যিকদের সক্রিয় ও সৃজনশীল থাকার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত দেখাবে। এই আশ্চর্য্য মানুষটি বিভিন্ন ভাষায় শব্দকোষ ও সাঁওতালি ভাষায় শব্দকোষ রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসাবেও আমি তাঁকে সাদর শুভেচ্ছা ও আন্তরিক স্বাগতাভিনন্দন জানালাম।অধ্যাপক দাস একটা আশ্চর্য্য প্রদীপ হয়ে আমাদের মধ্যে আছেন, আরও দীর্ঘদিন থেকে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, দেশ বিদেশের পাঠকদের মধ্যে তাঁর সাহিত্যের রসাস্বাদন পরিবেশন করবেন এবং উপহার দিয়ে যাবেন এই আমাদের সমবেত প্রার্থনা।

মহাশ্বেতা দেবী

(পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস)

অভিনব অভিধানঃ সাঁওতাল-বাংলা তুলনাত্মক শব্দভাণ্ডার

প্রফেসর ক্ষুদিরাম দাসের ‘সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান’ গ্রন্থটি পড়তে মনে হয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধির পরিমাণ যেন সীমাহীন।কেবলমাত্র বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ই তাঁর পাণ্ডিত্য সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য, গ্রীক ভাষা-সাহিত্য, শব্দ ও ধ্বনিতত্ত্ব ধর্ম ও দর্শন এমনকি বিজ্ঞানেও তাঁর জ্ঞান অপরিসীম।

ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে ভাষাতাত্ত্বিকের গবেষণার এক অমূল্য নিদর্শন এই সমশব্দ অভিধান। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষার বিকাশের মূল সূত্রগুলি-বিশেষ করে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হয়েছে। কিন্তু ভাষাচার্যের গবেষণায় সাঁওতালি ভাষা নিয়ে তেমন চর্চা হয়নি।এমনকি সাঁওতালি অভিধানও রচিত হয়নি।সেই মৌলিক পথে ভাষাচার্যের সুযোগ্য শিষ্য ক্ষুদিরাম দাস পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

যে ভাষার প্রাচীন লিপি নেই। যে ভাষার কোনো অভিধান রচিত হয়নি। সেই সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনায় বাংলাকে মিলিয়ে দেওয়া-সত্যিকারের এক দুরূহ পরিশ্রমসাধ্য কাজ। বহুক্ষেত্রে শুধু সাঁওতাল-বাংলা নয়, হিন্দি, ফারসি, প্রাকৃত, সংস্কৃত শব্দের নমুনা দিয়ে, ভারতীয় ভাষা পরিবারের এক সুদৃঢ় ঐক্য দেখিয়েছেন। বাংলাভাষা তথা ভারতীয় ভাষা মানচিত্রে দেশি-বিদেশী ভাষাবিদদের চর্চার ইতিবৃত্তে ‘সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান’ গ্রন্থটি এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। ভাষাবিদ ক্ষুদিরাম দাসের জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর প্রকাশিত এই গ্রন্থটি শুধু উল্লেখযোগ্য নয় বিরল এক অভিধান গ্রন্থ। সচিব সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিবেদন অংশে লিখেছেন-“বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস দীর্ঘকাল সাঁওতালি শব্দ নিয়ে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি বাংলায় ব্যবহৃত নির্বাচিত

সাঁওতালি শব্দের এই অভিধানটি রচনা করে আকাদেমিকে দিয়েছেন। স্বক্ষেত্রে সাঁওতালী বাংলার এই অভিধানটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের জগতে একটি বিশিষ্ট সংযোজন ঘটল"।আমাদের বাংলা ভাষার অভিধান রচনার ইতিহাস, তুলনামূলক অভিধান নেই বললেই চলে।অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে, সেই দুরূহবৃত্তে দুঃসাহসিক ক্ষুদিরাম, ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডার আর অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে তাঁর মেধাবী মননকে এক নতুন ভাষার ভুবনের সন্ধান দিয়েছেন। বঙ্গবাসী-বঙ্গভাষী সাঁওতাল জনজাতির কাছেও অতীব আদরণীয় সম্পদ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই নবঅভিধান নবায়িত করুক ভাষাপ্রেমিক ভারতবাসীকে।

সুরঞ্জন মিদ্দে

মনীষয়া দীপ্যতি

আচার্য ক্ষুদিরাম দাস শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

সমর্পিত

আচার্য সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী

সূচীপত্র

১) সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাঙ্লার ঘনিষ্ঠতা

২)বাঙলা-সাঁওতালী ভাষা-সম্পর্ক

৩)বাঙলা ভাষায় সাঁওতালী উপাদান

৪)সাও-বাঙলা অভিধান বিষয়ক প্রস্তাবনা

সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লার ঘনিষ্ঠতা

পাশাপাশি প্রচলিত দুই বা ততোধিক পৃথক গোত্রের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক লেন-দেন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। বাঙ্‌লা, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলি ইরান-ঘনিষ্ঠ বৈদিক সংস্কৃত থেকে নানাভাবে পরিবর্তনক্রমে আজকের অবস্থায় এসেছে। পরিবর্তনের মুখ্য কারণ অন্-আর্য অর্থাৎ দ্রাবিড়ভাষী ও কোল-মুন্ডা নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্ত-বিমিশ্রণ ও ভাষা-সংস্রব।

ভারতে মানুষ-বসতির আদিতম ইতিবৃত্ত কৃষ্ণচ্ছায়া-সমাবৃত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইরানীয় আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের আগে দ্রাবিড়ভাষীরা এবং তারও আগে অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর কোল-মুন্ডারা প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। এদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও সংহতিগুণে সমৃদ্ধ আর্যদের প্রথমে খানিকটা সংঘাত ও ক্রমে মিলমিশ ঘটে। খ্রীস্টপূর্ব অন্তত দেড় হাজার বছর আগে লেখা ঋগ্‌বেদের একটি কবিতায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-- "প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুঃ" অর্থাৎ তিন শ্রেণীর মানুষ খুবই 'প্রবল' বা সংখ্যায় অধিক ছিল। এরা কারা তা বোঝাতে পরেকার গদ্যভাষ্য ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে-- "বঙ্গাঃ বগধাঃ চেরপাদাঃ = পাড্যাঃ" অর্থাৎ বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ্য মানুষ। টীকাকার সায়ন ঐ সব অংশের বালকসুলভ বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা ঘটেছে ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত নামক বিখ্যাত কবিতাটির ক্ষেত্রেও। কবির উদ্দিষ্ট ছিল চতুর্বর্ণের মানুষ সহ কল্পিত স্রষ্টা 'পুরুষ' বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের উপস্থাপনা। এতে কবি সুকৌশলে বিভিন্ন বর্ণের চারিত্র্য বা বৃত্তির বিষয় মনে রেখে ঐ পুরুষের বিভিন্ন অবয়বের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছেন। যেমন, মুখজীবী ব্রাহ্মণকে তার মুখ। বাহুজীবী ক্ষত্রিয়কে তার বাহু, কৃষিপণ্য-ব্যবসায়ী বৈশ্যকে তার উরু এবং জীবিকা ও আশ্রয়ের উদ্দেশে নিয়ত চলমান "joy in treks from land to land" শূদ্র। অর্থাৎ অন্-আর্য কোল-মুন্ডাদের তার পদরূপে রূপকের আশ্রয়ে দেখেছেন। অথচ এই নিয়ে পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা উচ্চ-নিচ সমাজভেদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাই হোক, ঐ পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব-দক্ষিণ যে কোল-মুন্ডা অধ্যুষিত ছিল তা নানান সূত্র থেকে বোঝা যায়। ক্রমে অনার্য-বিমিশ্রিত ও চতুর্বর্ণ-মূলক সমাজ সংহতিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি-সহায় আর্যসংস্কৃতির ধারা গাঙ্গেয় সমতল ধরে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করতে থাকে। প্রথমে ধর্মপ্রচারকেরা আসে, পরে কৃষিভূমি গ্রাসকারী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের দল। খেরোয়াল বা সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর প্রভৃতি নিষাদদলের অধিকাংশ বশীভূত হয়ে তাদের অধীনে কৃষির কাজ ও অন্যান্য বৃত্তি নেয় ও নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যারা তা পারে নি তারা স্বাধীন জীবিকা নিয়ে প্রিয় অরণ্য-অঞ্চলকেই আশ্রয় করে কাটাতে থাকে।

নিষাদ বা কোল-মুন্ডাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে খেরোয়াল-বংশ, পরে যাদের সাঁওতাল (= সামন্তপাল অর্থাৎ রাজন্য-গোষ্ঠীর রক্ষক) নামে অভিহিত করা হয়েছে তারাই ছিল আগাগোড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ও কৃষিকর্মবিৎ এবং আজও রূপান্তরে তা-ই আছে। সাঁওতালদের মধ্যেও বহু শ্রেণীবিভাগ হয়েছে, কিন্তু পুরাতন ও আধুনিক সব বিভাগ মিলিয়ে অল্প স্বল্প পরিবর্তন সহ ওরা একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।চার পাঁচ হাজার বছর ধরে ওরাই পূর্বাঞ্চলের আমাদের মুখ্য পূর্বপুরুষ, অবশ্য তারই মধ্যে বহু-বিমিশ্রিত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ্য সামাজিকদের মিশ্রণও কল্পনীয়। আর বাঙ্‌লার উত্তর ও পূর্ব-ভাগে ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর নেওয়ারী বা নেপালী, লেপচা, কোচ, মেচ, রাভা প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে ঐ অঞ্চলের রক্তে ও ভাষায় বিমিশ্রিত বাঙালীত্ব ঐভাবেই লক্ষণীয় হয়েছে। প্রাকৃত-অপভ্রংশ বাঙ্‌লার সঙ্গে ভোট-বর্মী শাখার ভাষা-মিশ্রণ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য আমাদের জানা নেই, কারণ, ওদের ভাষা নিয়ে মিশনারিদের লিখিত দু'একখানি অভিধান ছাড়া আলোচনা গবেষণা তেমন কিছু হয়নি বললেই চলে। কিন্তু মুন্ডারী-সাঁওতালী নিয়ে অভিধান ব্যাকরণ লেখা হয়েছে এবং ওদের কবিতা বা গানের অনুবাদও বেশ কিছু হয়েছে, যার ফলে সাঁওতাল-মু-ডারী ভাষা আমাদের অপরিচয়ের গন্ডি অনেকটাই অতিক্রম করতে পেরেছে।

বাঙ্‌লা ভাষার বৈজ্ঞানিক রীতির অভিধান করতে গিয়ে সংস্কৃত-মূল নয়, এবং আরবী-ফারসী প্রভৃতি বিদেশী-মূলও নয় এমন বহু লৌকিক শব্দের সূত্র সাঁওতালী অভিধান ও ব্যাকরণে নিঃসংশয়ে মিলছে।

ক্যাম্‌বেল্‌ ও বোডিং সাহেবের অভিধান ও ব্যাকরণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। বাঙ্‌লা বাক্যের বিশিষ্ট পদবিন্যাস, সহায়ক শব্দযোগে কারক নির্দেশ ও ক্রিয়ারূপ গঠন, শব্দাণু এবং অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শ্বাসাঘাত-প্রবণতা ও শব্দদ্বৈত প্রভৃতি যে-যে বিষয়ে বাঙ্‌লা (ও হিন্দী প্রভৃতি) সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে ভিন্ন পথ নিয়েছে তার অধিকাংশেরই হদীস সাঁওতালী ব্যাকরণ-অভিধান, ছড়া ও গীতরীতি দিতে পারছে। বহুপূর্বে সংস্কৃতের সঙ্গে কোল-মুন্ডা ভাষার যে-সব লেন-দেন হয় তাতে কে দাতা ও কে গ্রহীতা এমনটা আজকের দিনে হলপ করে সম্পূর্ণ বলা না গেলেও কিছু বলা যায়, নিশ্চয়ই। তাই নিয়ে গবেষকেরা অল্পস্বল্প লিখেওছেন। কিন্তু এই লেনদেন পর্যায়ে দ্রাবিড়ের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক নিয়ে যেটুকু গবেষণা হয়েছে সে পরিমাণ মুন্ডারী-সাঁওতালী বিষয়ে হয় নি। অভিধান থেকে দেখা যায়, শব্দাবলীতে সাঁওতালী মোটামুটি সমৃদ্ধ ভাষা। তা কেবল সংস্কৃত থেকেই ঋণ নিয়েছে এমন নয়, কিছু দ্রাবিড় থেকেও, যেমন দ্রাবিড়ও নিয়েছে মুন্ডারী থেকে, এবং হিন্দী-বাঙ্‌লার মধ্যস্থতায় আরবী-ফারসী, পোর্তুগীজ-ইংরেজি থেকেও ঋণ নিয়ে তার ভান্ডার পূর্ণ করেছে। তা ছাড়া বাংলা-হিন্দীর মধ্যস্থতায় কিছু তৎসম-তদ্‌ভব শব্দও অনায়াসে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে যে ব্যাপারটি আমাদের অপ্রত্যাশিত ভাবে বিস্মিত করেছে তা হল সাঁওতালী অর্থাৎ কোল-মুন্ডা গোষ্ঠীর ভাষা থেকে বাঙ্‌লার প্রচুর ঋণ। লক্ষণীয় এই যে, সাঁওতালী অভিধান ও ব্যাকরণ সামনে না থাকায় খ্যাতনামা বাঙ্‌লা অভিধান-নির্মাতারা এমনকি ভাষাতাত্ত্বিকেরাও বহু সাঁওতালী শব্দ বা প্রত্যয়কে জোর করে সংস্কৃত-মূলে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস করেছেন। ইতিহাসানুগ ভাষাবিকাশের স্মরণীয় রূপকার সুনীতিকুমার 'দেশী' শব্দের অবদান বিষয়ে প্রখরভাবে সচেতন থেকেও দু'চারটে ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করে দেখেছেন সেগুলিকে সংস্কৃত-মূলে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। আমাদের ধারণা, বাঙ্‌লা, হিন্দী, ওড়িয়া তাদের সাহিত্যিক রূপ নেওয়ার বেশ কিছু পূর্ব থেকেই কোল-মুন্ডা শব্দ-প্রত্যয় বিভক্তি মৌখিক ব্যবহারে চালু করে রেখেছিল।সাহিত্যে তখনই তার প্রকাশ ঘটেনি। কারণ, সাহিত্যিক ভাষার চিরাচরিত রক্ষণশীলতা। আমাদের চর্যাগীতিতেও এই রক্ষণশীলতারই পরিচয় মিলছে, যদিও শতকরা আট-দশটি ক্ষেত্রে অন্‌-আর্য শব্দের ব্যবহার অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এরপর থেকে তিন-চার শতাব্দী মধ্যে বাঙ্‌লা যখন নিজমর্যাদা লাভ করেছে অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভ্রংশের বাক্‌রীতি ও ছন্দঃপদ্ধতি অতিক্রম করেছে(যেমন কৃষ্ণকীর্তন, রামায়ণ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে) তখন থেকে লৌকিক বা কোল মুন্ডা শাখার ভাষাগুলির অর্থাৎ মুখ্যভাবে সাঁওতালীর প্রভাবও সাহিত্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে বাঙ্‌লা-হিন্দীর পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে আমাদের সব থেকে ঘনিষ্ঠ অনার্য-ভাষা তার স্বাভাবিক ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে আধুনিক ভাষার স্বভাব তৈরি করে দিয়েছে। বিষয়টিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায় যে এককালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সংস্কৃত-প্রাকৃতকে বরণ করে নিতে বাধ্য হলেও তাঁদের বংশানুক্রমে নিজভাষা হারানোর ক্ষতিটাকে যতদূর সাধ্য পূরণ করে দিয়েছেন।

এই ইতিবৃত্ত মোটামুটি স্মরণে রেখে আমরা ধ্বনি-বর্ণ থেকে অভিধান-ব্যাকরণ পর্যন্ত সাঁওতালী থেকে আমাদের গৃহীত ঋণ বিষয়ে পথ-প্রদর্শনের একটা প্রয়াস করছি।

ধ্বনি ও বর্ণ। স্বরবর্ণ--অ, আ, আঁ, ই, উ, এ, এ্যা, ও। আমাদের আংশিক 'ও'-রূপ প্রাপ্ত (ও ে) অ-কারের উচ্চারণ সাঁওতালীতে নেই। বস্তুত এটি প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গেও দুর্লভ। বলা চলে যে ঐ বিকৃত 'অ' মোটামুটি কলকাতা-কেন্দ্রিক, বড়জোর ভাগীরথী-তীর সংলগ্ন আধুনিক উচ্চারণ। তবে এটা ঠিক যে ই বা উ পরে থাকলে আগেকার অ পশ্চিমবঙ্গেও আংশিক ও-রূপ নেয়। সাঁওতালীতে স্বর বা ব্যঞ্জনের কোনো প্রভাব-জাত উচ্চারণ-শৈথিল্য নেই বললেই চলে। 'অ' পুরা কণ্ঠ্য উচ্চারণের। সাঁও আ = বাঙ্‌লা আ। আঁ সাঁওতালীর একটি বিশিষ্ট স্বর। এর সাদৃশ্য আমাদের পরিচিত কোনো ভাষাতেই নেই। এটি জিভ উল্টে প্রতিবেষ্টিত উচ্চারণে কণ্ঠে উচ্চারিত আ। কিছুটা আ + সংক্ষিপ্ত বা দ্রুত 'উ' এর মত। ঐ স্বরযুক্ত শব্দ বাঙ্‌লায় গৃহীত হয়ে স্বরটিকে শুদ্ধ আ বা অ এর রূপ দিয়ে থাকে। আবার দেখা যায় অন্য ভাষা থেকে সাঁওতালীতে গৃহীত শব্দের অ, আ উচ্চারণে আঁ হচ্ছে। যেমন অতি = আঁড়ি, রানী = রাঁনী। কর্ম থেকে ক্রিয়ারূপ কাঁমি। বৈরি = বাঁইরী (বাঙ্‌লায় নিম্নবর্ণের বাইরি, বাউরি দ্রঃ)। বধূ = বাঁহূ = বাঁয়ু = বাঁই। সাঁও মাঁঝি = বাঙ্‌মাঝি। আনাড়ি = আঁনাঁড়ি। সাঁও বাঁবু (পুত্র, ছেলে) = বাঙ্‌ বাবু।

কিন্তু সাঁও আঁৎ (= সুযোগ) = বাঙ্‌ অৎ = ওৎ। সাঁওতাল বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য অলচিকি হরফে যাঁরা প্রাথমিকের বই লিখেছেন তাঁরা এই স্বরটিকে বর্জন করেছেন দেখি।

সাঁও ই, উ বাঙলার সঙ্গে তুলনায় জিভের সর্বোচ্চ অবস্থানের স্বর। বাঙলায় অতদূর নয়, ই এ-তে এবং উ সহজেই ও-তে রূপান্তরিত হতে পারে। সাঁও এ্যা = বাঙ্‌ এ্যা। সংস্কৃত প্রাকৃত উচ্চারণে ছিল না, বর্ণমালাতেও নেই এমন এ্যা স্বরটি সাঁওতালী থেকেই বাঙলায় সংক্রমিত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া এমন মনে করা যেতে পারে। সাঁওতালীতে যৌগিক স্বর নেই, স্বরের বা ব্যঞ্জনের স্পষ্ট এবং পৃথক উচ্চারণই নিয়ম, তবু অই, অএ, আএ প্রভৃতির দ্রুত উচ্চারণে যৌগিকতা অনিবার্য হয়েছে এমন মনে করা যায়।

ব্যঞ্জনবর্ণ। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, নাসিক্য সহ অধিকাংশেরই উচ্চারণ বাঙ্‌লার কাছাকাছি। কেবল বিশেষ যা তা বলা হচ্ছে। সাঁও ঞ (য়ঁ) বাঙ্‌লার মত 'ন' এর রূপ নেয় না। বস্তুত ঞ উচ্চারণ বাঙ্‌লায় নেই বললেই চলে। ব এবং য এর অন্তঃস্থ উচ্চারণ সাঁওতালীতে আছে। 'র' এর উচ্চারণে কম্পন বাঙ্‌লা থেকেও বেশী। ড় এর প্রতিবেষ্টিত উচ্চারণ অগ্রতালু ছাড়িয়ে মূর্ধায় এবং এতে সজোরে বাতাস ছিটকে ফেলার ভাব আরও বেশী। সাঁওতালীতে ন একটাই এবং তার মহাপ্রাণিত উচ্চারণও দেখা যায় (ন্‌ + হ), অনেক আগে বাঙ্‌লাতেও র এবং ন এর মহাপ্রাণিত উচ্চারণ ছিল (কৃষ্ণকীর্তন দ্রঃ), কিন্তু হিসাবে ণ সাঁওতালীতে না থাকলেও ট, ঠ, ড এর সঙ্গে যুক্তাক্ষরে ণ উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

সাঁওতালীতে কেবল 'স'। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন, তাহলে মাগধী প্রাকৃতে ও বাঙ্‌লা সাধারণ উচ্চারণে কেবল 'শ' কেন ? র = ল-ই বা আগে কিভাবে হয়েছিল ? কারণ, সাঁওতালী মুন্ডারীতে তো 'র' এর ব্যবহারও যথেষ্ট। আমরা এর সমাধান করতে পারিনি। কেবল এইটুকু নিশ্চিত মনে করেছি যে দ্রাবিড় প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি বিশেষে ঋ, র + ত,থ = ট, ঠ এর রূপ নিয়েছে। কথা এই যে যদি পূর্বাঞ্চলের আর্য ভাষায় খ্রী পূঃ শতাব্দীতেই 'শ' এবং 'ল' উচ্চারিত হয় এবং তাতে অন্‌-আর্য প্রভাব না থাকে তাহলে এই অঞ্চলে কাশ্মীরী দরদীয় শাখার আর্যদের মত এমন এক আর্যের দল অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন যাঁদের শ-কার এবং ল-কারে প্রবৃত্তি আগেই ছিল। অর্থাৎ মধ্যদেশীয় আর্য থেকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্যের দল এ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। তাঁদের সংস্কৃত প্রাকৃত দুই-ই মধ্যদেশ থেকে কিছু পৃথক্‌ ছিল, যেমন ছিল কাশ্মীরী আর্যদের। দেখা যায়, আমাদের উচ্চারণে আজও 'শ' টা কোনোক্রমে টিঁকে গেছে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের ঐ প্রথম অবস্থার পর থেকে র-বর্ণের লত্ব-কে আমরা বড় একটা প্রশ্রয় দিই নি। এখানে মুন্ডারী বা সাঁওতালীর প্রভাবের সম্ভাবনার বিষয় স্বতই মনে হয়। স্বরে স্বরে সন্ধির ক্ষেত্রে বাঙ্‌লার মতই সাঁওতালীতে য়-শ্রুতি এবং ব (উঅ)-শ্রুতি দেখা যায়। আর পরে স্বরবর্ণ থাকলে ক্‌ চ্‌ ট্‌ ত্‌ প্‌ ঘোষবৎ হতেও দেখা যায়। তা ছাড়া বাঙলার মতই সাঁওতালীতে অনুনাসিকের ব্যবহার যথেষ্ট। এরই কারণে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে এখনও রাখেঁছি, খায়েঁছি (কৃষ্ণকীর্তন--রাখিঞাছে, পাইঞাছে) প্রভৃতি শোনা যায়। প্রাকৃতে সমীভূত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের বিকল্পে ং + ব্যঞ্জন (বক্র = বংক, পুস্তিকা = পুংথিআ) অর্থাৎ নাসিকীভবন কোল-মুন্ডা প্রভাব-জাত বলেই মনে হয়।

ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সাঁওতালীর এমন একটি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের পরিচিত অন্য কোথাও দেখছি না। এটি হল কোনো কোনো শব্দান্তে ক্‌, চ্‌, ত্‌ ও প্‌ এর সহসা অবরুদ্ধ বা আটকে-যাওয়া উচ্চারণ। এরকম উচ্চারণে ঐ ব্যঞ্জনগুলি হসন্ত ও খুব আংশিক রূপে প্রকাশ পায়। ঐরকম অবরুদ্ধ ব্যঞ্জনযুক্ত শব্দ বাঙ্‌লায় গৃহীত হলে উচ্চারণে তার বিলোপ ঘটানোই নিয়ম, তবে শব্দটি একাক্ষর হলে হসন্ত উচ্চারণ সহ সেটি থেকেও যেতে পারে। যেমন - দাঃক্‌ = সং উদক, চালাঃক্‌ = চাল্‌ (এগিয়ে যাওয়া), ওড়াঃক্‌ = অড়া (গৃহ), সতোঃক্‌ = সত্য (সত্যপীর), লাগিত = লাগি, ঠেঃচ্‌ = ঠে (পাঁশুটে, তামাটে) ইত্যাদি। লক্ষণীয় এই যে সদ্যঃপ্রবর্তিত অলচিকি হরফের সাঁওতালী প্রাথমিক পাঠের বইয়ে এই অবরুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্জিত হয়েছে।

সংস্কৃত প্রাকৃত মূল থেকে সাঁওতালীর বা মুন্ডারীর সম্ভাব্য ঋণের বিষয়টি তুলনামূলক গবেষণা--সাপেক্ষ এবং এবিষয়ে প্রতিবন্ধকতা এখানে যে আজকের সাঁওতালী-মুন্ডারী হাজার দু'হাজার বছর আগে কোন্ রূপ নিয়ে বর্তমান ছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু পারস্পরিক ঋণ যে যথেষ্ট সম্ভাব্য ছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমতও নেই। আমরা প্রথমে এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি অনুমান জানাচ্ছি যদিও ব্যাপারটা সম্ভাব্যতার পর্যায়েই থাকছে এবং কে কার থেকে নিয়েছে তাও সব ক্ষেত্রে সঠিক নির্ণয় করা যায় না ঃ

সাঁও	সংস্কৃত	সাঁও	সংস্কৃত
আঁতি	অতি	আপা (পিতা)	আত্মা
আইয়ো (মা)	আর্যা অবিধবা	আরহ (আরও)	অপর+ ই (হে--কী আছে)
অরঃক্	আরক্ত	আদ্ (প্রারম্ভ)	আদি
আরসি (আয়না)	আদর্শ	আজ্ঞা, জিয়া	আর্যক
জাত	জাতি	জাঁহাঁ (যে কোনো)	যস্মিন্ ?
জাঁহাঁ তাঁহাঁ (যেটা সেটা)	যস্মিন্ তস্মিন্ ?	মা (কোমল অনুজ্ঞা এবং না করুক, না আসুক এরকম অর্থে)	মা (নিষেধে)
মাএজিউ (নারী)	মাতৃজীব	সার (তির)	শর
জত (সকলে)	যাবৎ, (জেত্তিঅ)	পিছাউড়ি বোঙ্‌পাছুড়ি = চাদর, উত্তরীয়)	পশ্চাৎপট (--বেন্ট)
বাড়াই (বোঙ্‌ বড়াই)	বৃদ্ধ +	ওঝা (বৈদ্য)	উপাধ্যায়
সি এাঁ (সীমা)	সীমন্	জানাম্	জন্ম
বাড়াই (বোঙ্‌ বা'ড়)	বৃক্ষ	মঞ্জ্	মঞ্জু
জিয়ন	জীবন	কুই	কূপ
বেপারি	ব্যাপারী	তোআ (দুধ)	তোয় (জল)
তেঃত্ (প্রত্যয়)	ত্ব	ভিতরি	অভ্যন্তর
ওনা (উহা)	অদস্ ??	কামি (কাজ করা)	কর্ম
পতিআই	প্রত্যায়য়তে	পানাহি	উপানৎ
কেৎ (অতীতবোধক প্রত্যয়)	কৃতম্	নিন্দা (রাত্রি)	নিদ্রা
হোএ (হওয়া)	ভূ--ধাতু	হাতাও (হাতানো)	হস্তায়তে
নেন -- নেপেল (পুনঃপুন দেখা)	সংস্কৃত যঙন্ত ক্রিয়া তুলনীয়		
দাল -- দাদাল (পুনঃপুন মারা)			
রড় -- রপড় (পুনঃপুন বলা)			
বালে (শিশু)	বালঃ	দাতরম্ (কাস্তে)	দাত্র
লুউহো (কড়াই)	লৌহ	ভাপ	বাষ্প
ধরম্	ধর্ম	বিজলি	বিদ্যুৎ
বাহির	বহিঃ	চালাঃক্	চল্
সেতেঞ	সিক্তম্	সাড়ি	শাটি
ভাগনী	ভাগিনেয়	জানায়ে (জামাই)	জামাতা
বহক্ (মাথা)	বহ +	বেলা, বেরু	বেলা
বাই	বায়ু	সেবা	সেবা
দাল্ (প্রহার করা)	দল	নাঁওয়াঁ	নব
গাই	গাভী	জগ (মাঝি)	যজ্ঞ
নাএকে (পুরোহিত)	নায়ক	জুদি	যদি

ঘাও	ঘাত	গুপি (গোরক্ষক, শস্যরক্ষক)	গোপী
-তে (প্রত্যয়। ওড়াঃক্-তে, ইস্কুল-তে)	তস্	কুআঁর (অবিবাহিত)	কুমার
দস্	দোষ	পাঁচরি	প্রাচীর
দুক্, দিক (দিক্কৌ)	দুঃখ	অবুক্ (ধোওয়া)	অপ্ +
দুয়ার	দ্বার	ডাঁটা	দন্ত
গতম্	ঘৃতম্	হরিআঁর (সবুজ)	হরিৎ
সাঁও	সমম্ ইত্যাদি।		

সাঁওতালীতে আরবী, ফারসী, পোর্তুগীজ ও ইংরেজি যে সব শব্দ দেখা যায় তা সাঁওতালেরা বাঙলা হিন্দী থেকেই মুখ্যভাবে অর্জন করেছে তা ছাড়া তদ্ভব কিছু শব্দও বাঙলা হিন্দী থেকে তাদের গ্রহণ করাও স্বাভাবিক। এই নিয়ে সাঁওতালী ভাষায় শব্দের সংখ্যা কমবেশী তিরিশ হাজারের মত হবে। এখন বাঙলার উপর নিশ্চিত ও সম্ভাব্য সাঁওতালী শব্দ-প্রত্যয়াদির প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক। বাঙলা প্রত্যয় ও সংযোজক, বিয়োজক, সহায়ক ও বহুবিচিত্র মনোভাব-জ্ঞাপক শব্দাদি। সহায়ক শব্দ বা অনুসর্গ যোগে কারক-সম্পর্ক নির্দেশ সাঁওতালী ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। বাঙলা, হিন্দী, ওড়িয়াতেও তাই।

বাঙলা ত, তো। সাঁওতালী বাক্যে অনুমান মূলক বা সামান্য নিশ্চয়-অনুভব জ্ঞাপক 'দ' এর ব্যবহার প্রায়শই দেখা যায়। এছাড়া প্রশ্ন বা অনুজ্ঞাভাবকে কোমল করার জন্য ব্যবহৃত হয় 'দো'। বাঙলা বাক্যে ত এবং তো এর ব্যবহার ঐ দ-দো এর প্রভাবজাত। আমি ত (তো) জানি না। সে ত চলে গেল। সে তো আসবে না। তুমি তো পারবে না দেখছি। কাজটা কর তো। কোনো শিক্ষিত সাঁওতাল ব্যক্তিকে বাঙলায় কিছু বলতে বললে তাঁকে প্রতি বাক্যে এক বা একাধিক ত ব্যবহার করতে আমরা শুনেছি। এই 'দ' সাঁওতালীতে প্রায়ই কর্তার ঠিক পরেই বসে। বাঙ্ ত, তো এর ক্ষেত্রেই তাই। তবে প্রশ্নের ক্ষেত্রে বসে বাক্যের শেষে। যাবে না তো ? বাঙলা-ই। সেই, আমারই, তোমারই। অবশ্য সং 'হি'ও স্মরণীয়। কিন্তু যাবই, করবই ক্ষেত্রে 'গি' অবশ্যই চিন্তনীয়। সাঁও গে বাঙলায় কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত 'গিয়ে' শব্দেরও জনক। যেমন, সেটা হল গিয়ে ...। ভেবেচিন্তে কিছু নিশ্চয় করে বলার প্রয়াস।

বাঙলা 'ও'। আমিও, তুমিও। মধ্য বাঙলায় আমিহ, সেহ, সেহো। সংস্কৃত 'অপি' থেকে এই হ আসতে পারে না। সাঁও হঁ (এবং, also অর্থে) থেকে আসাই স্পষ্টতর। হিন্দী ভী বরং অপি = বি + হি থেকে আসা সম্ভবপর।

বাঙলা 'বা'। নাই বা গেলে। তুমিই বা বললে না কেন ? সাঁও নিষেধার্থক বাঙ্, বা এর মূল। সংস্কৃত বিকল্পবোধক বা, অথবা এরকম ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

বাঙলা 'না'। অস্বীকৃতি-বাচক 'না' নয়। অনুনয় সহ তাগিদ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না। বলো না। করোই না। সাঁও 'না' দুই নারীর মধ্যে বিনয়-সম্ভাষণে প্রযুক্ত হয়। বাঙলায় সাধারণভাবে নারী-পুরুষ দুয়ের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

সাঁও গ, গে। ক্রিয়াগত বক্তব্যে কিঞ্চিৎ জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বাঙলায় তুমি এটা পারবে না ? তুমি এই দামে দেবে না ? উত্তর-না গ। করুক গে, মরুক গে। সাঁওতালী 'গিয়ে' ও তুলনীয়। তদ্ভব 'গিয়া' শব্দের সঙ্গে এর যোগ থাকতেও বা পারে। আধুনিক বাঙলায় একইভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ গ, – 'ক' রূপ নিয়েছে। জানিনাক পারিনাকো।

সাঁও 'গো'। অর্থ 'মা'। উপরোক্ত 'গ'ও কদাচিৎ 'গো' তে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু নারীদের কথার মধ্যে, পুরুষদের সম্বোধনে ও জিজ্ঞাসায় এবং অজস্র গানে ও কবিতায় 'গো' এর ব্যবহার সর্বজনবিদিত।

সাঁও -তে। দিকে, পানে অর্থে। ঝরনা-তে = ঝরনার দিকে। ওড়াঃক্-তে = গৃহের পানে। বির-তে = জঙ্গলের দিকে। বাঙ্‌লা অধিকরণের ত, তে এর সঙ্গে এর বহিরঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং প্রত্যয়টি অন্ত বা তস্ জাত কিনা ভাবতে হবে। -তে সাঁও অধিকরণের বাচকও কদাচিৎ হয়ে থাকে।

সাঁও -রে। অধিকরণ-বাচক। এটি ওড়িয়ায় হুবহু রক্ষিত হয়েছে। ঘররে, পুরীরে, ইস্কুলরে। সাঁও সম্বন্ধ বাচক রেআন্ এবং রেআক্ ঐ রে এরই সম্প্রসারিত রূপ কিনা এবং তার সঙ্গে বাঙ্‌লা সম্বন্ধের র, এর যুক্ত কিনা ভাবতে হবে।

সম্বন্ধ এবং সেইসঙ্গে বিশেষণ-বোধকতার দিক দিয়ে সাঁওতালী ও বাঙ্‌লা প্রায় অভিন্ন। সাঁওতালী-রেআন্ প্রযুক্ত হয় ব্যক্তি বা প্রাণী সম্পর্কে এবং-রেআক্ অপ্রাণ ক্লীবলিঙ্গ বিষয়ে। এই পার্থক্য বিশেষণ-বোধকতারই সামিল।

বাঙ্‌লা লাগি, লেগে। সাঁও লাঁগিঃত্। অর্থ জন্য, নিমিত্ত। বাঙ্‌লাতেও তাই। জোর করে সংস্কৃত 'লগ্ন' শব্দের সঙ্গে এর সম্বন্ধ টানা সমীচীন নয়।

বাঙ্‌লা সঙ্গে। সাঁও সঙ্গে। সংস্কৃত সমম্ + সাঁও গে যোগে এটি উৎপন্ন মনে হয়। সাঁও সঞ্চ বলে সমার্থক অন্য একটি শব্দও রয়েছে। মধ্য বাঙ্‌লা সঞ, সঞে তুলনীয়।

বাঙ্‌লা থাকা, থেকে। মূল সাঁও তাহেং, তাহেকান্ বর্তমান ও অতীত। একই অর্থ। এর মূল হিসাবে জোর করে স্তম্ভ + কৃ ধরা হয়েছে।

বাঙ্‌লা --মন, --মতি, মতন, মতো। তুলনা বাচক। যেমন, তেমন। মধ্য বাঙ্--মতি = যেমতি, তেমতি জেনমতে। সং মন্ ধাতু জাত মতি, মতম্ এর সঙ্গে এটি বাচকত্বে মিলে না। সাঁও 'মেন্তে'ই ওর মূল। সাঁও মেনে-অর্থ কারণে, নিমিত্তে। অর্থসংশ্লেষে ঐ রূপ দিয়েছে মনে হয়। সাঁও জেমন = যেহেতু, যার জন্য। মাহা = সদৃশের দিকে।

বাঙ্‌লা ঠেঁয়ে। কাছে, স্থানে। তার ঠেঁয়ে চেয়ে আন। সাঁও ঠাঁই = স্থান এবং ঠেন্, ঠেঃচ্ = কাছে। সংস্কৃত 'স্থান' থেকেও গৃহীত হতে পারে।

বাঙ্‌লা -টি, -টা। সাঁও 'গোটা' শব্দ থেকে। গোটা = সমগ্র, অবিভক্ত এক। কৃ-কী. বাঁশী--গুটি। ওড়িয়া গোটে।

হিন্দী --সা। মত, রূপ, সদৃশ অর্থে। বাঙ্‌লাতেও ক্বচিৎ। সাঁও সা-অর্থ দিকে, গা ঘেঁসে। আর 'সাঞ' অর্থে পূর্ণভাবে, সব দিক দিয়ে। সং সদৃশ শব্দ থেকে সা ধারাবাহিক ভাবে আসতে পারে না। এ্যায়সা, জ্যায়সা প্রভৃতির 'সা' সাঁও 'সাঞ' থেকেই নেওয়া হয়েছে মনে হয়।

হিন্দী -সে। অর্থ--থেকে চেয়ে। উস্‌সে, গাঁওসে। সাঁও আভিমুখ্য বাচক শব্দ সেন্, সেঃচ্ এর মূল হওয়াই সম্ভব।

বাঙ্‌লা এ, এই। সম্বোধনসূচক। সাঁওতালীতেও তাই। এ বাবা, এ মা। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ মৌখিকে এই 'এ' এখনও জীবন্ত। সাঁও এ + গি = বাঙ্ এই। এই, শোন্। এই, জানিস্ ভাই।

বাঙ্‌লা ইয়ে। সাঁওতালী ও বাঙ্‌লা দুয়েতেই স্মৃতিভ্রম-সংশোধক অব্যয়। ইয়ে, মানে, বল্‌ কী.... ইয়ে, তোমার সেই ব্যাপারটার কী হল ? সাঁও এয়াদ্‌ = স্মরণ করা, হিন্দীতে ইয়াদ। এটি ফার. য়াদ্‌ থেকে। সুতরাং 'ইয়ে' ফারসী থেকে হিন্দী হয়ে একই সময়ে সাঁও = ও বাঙ্‌লায় এসেছে মনে করা যেতেও পারে।

বাঙ্‌লা 'আর'। সাঁও আর। এবং অর্থে তুমি আর আমি। এই 'আর' সং অপর-জাত হতে পারে না। কৃ--কী আঅর = অপর। অর্থ তা ছাড়া, ভিন্ন, অন্য।

বাঙ্‌লা হাঁ। সম্মতিবাচক। সাঁও হেঁ। বাঙ্‌লা হে, অহে, ওহে। সম্বোধনে। সাঁও 'হো'।

সাঁও তবে। অর্থ তখন। মধ্য বাঙ্‌লাতেও তাই। বর্তমানে এটি বিয়োজক অব্যয়। অর্থ কিন্তু'র মত। সং যাবৎ, তাবৎ থেকে জবে, তবে ধরলেও মাঝখানে জেব্ব তেব্ব শব্দে অনার্য-প্রভাব ধরতেই হয়। আমাদের মতে ভবিষ্যৎ--বাচক 'তবে' -তব্য প্রত্যয় থেকে অর্ধতৎসম হিসাবে এসেছে।

বাঙ্‌লা সাথে। সাঁও স ঞ (সমম্‌) + তাহেন (অর্থ থাকা) যোগে সমুৎপন্ন।

মধ্য বাঙ্‌লা 'মেনে'। আল মেন বড়ায়ি। যদি গৌর নহিত কি মেনে হইত। সাঁও মেনা অর্থ হওয়া, থাকা থেকেই ঐ মেন, মেনে।

খ। শব্দ ও বাক্য।

সাঁওতালী শব্দ কোনো-ক্রমেই প্রকৃতি--প্রত্যয়-জাত নয়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ শব্দে জোড়--লাগার। তবে মূল শব্দের ভগ্ন রূপ হিসাবে প্রত্যয়ের মত কিছু অবশ্যই দেখা যায়। সেগুলি প্রাণী--অপ্রাণ, বিশেষ্য--বিশেষণ, কারক--সম্পর্ক ক্রিয়ারূপ প্রভৃতির দ্যোতক। স্ত্রীবাচক প্রত্যয় সাঁওতালীতে ছিল না। কারণ স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ ছিল না। হিন্দী ও বাঙ্‌লার সংস্রবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ই' অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এই মাত্র। যেমন, কোড়া-কুড়ি, হোন্ডা--হুন্ডি, কাকা--কাঁকি, কালা--কালি, বুড়া--বুড়ি। বাঙ্‌লাতেও স্ত্রী--পুরুষ পার্থক্যের নিয়ম অনেকটাই শিথিল, অন্তত সংস্কৃতের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। শব্দের সঙ্গে শব্দ ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে যাওয়ার ফলে সাঁওতালীতে সমীভবন বা সন্ধি, শ্রুতিধ্বনি, আগম এবং স্বরলোপ প্রবণতাও দেখা যায়।

সাঁওতালীর সঙ্গে বাঙ্‌লার একটা বিষয়ে প্রবল সাদৃশ্য দেখছি। সাঁওতালীতে প্রায় যে-কোন শব্দই আ-যোগে ক্রিয়ারূপ নিতে পারে। বাঙ্‌লায় মূল ধাতুগুলি সংস্কৃতের সাদৃশ্যে অধিকাংশই হলন্ত, যেমন, কর্‌ চল্‌ পড়, দেখ্‌ শুন্‌। এগুলিকে ক্রিয়াপদে ফেলতে গেলেই আমাদের বলতে হয় করা, চলা, পড়া, দেখা, শুনা = শোনা ইত্যাদি। এমন কি সংস্কৃতমূলে যে ধাতুগুলি আ-কারান্ত এ-কারান্ত ছিল তার উপরেও বাঙ্‌লা 'আ' যোগ করে, যেমন পা--পাওয়া, যা--যাওয়া, খা--খাওয়া, দে--দেওয়া ইত্যাদি। বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃত--প্রাকৃত--জাত হলেও ও দুই থেকে নানাভাবে বিচ্যুত হয়ে পৃথক্‌ পথে চলেছে। বাঙ্‌লা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে বহু ক্ষেত্রেই পৃথক্‌। আর যেখানে যেখানে তার বিচ্যুতি সে-সব অংশের অনেকগুলিই কোল--মুন্ডা প্রভাব--জাত বলে আমরা লক্ষ্য করেছি। হিন্দীর ক্ষেত্রে সংস্কৃত--বিচ্যুতি এত ব্যাপক না হলেও হিন্দীও প্রত্যয়ে, সহায়ক শব্দ ব্যবহারে, বাক্যের কাঠামোতে ও পদস্থাপন রীতিতে অনার্য-নীতির বাহক হয়ে চলেছে।

সাঁওতালীতে কারক--নির্মাণে, ক্রিয়ার কাল প্রভৃতির গঠনে ও বাক্যের সূক্ষ্ম অর্থদ্যোতনায় অব্যয়জাতীয় সহায়ক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাঁও ক্রিয়াপদের পুরুষবাচকতার ক্ষেত্রে আমাদের মত পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভক্তির স্থানে সর্বনামগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ বসে। সংস্কৃতের মত সাঁওতালীতে দ্বিবচন দেখা যায়। আবার দ্বিবচন ও বহুবচনেরও দুই বিভাগ দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, সাঁওতালীর এ রীতি স্বকীয়। সংস্কৃতের

অনুসরণে নয়। শব্দরূপে বাঙলা-হিন্দী যে সংস্কৃতের বিভক্তিগুলি ত্যাগ করে অনুসর্গ-মুখী হয়েছে তাতে কোল-মুন্ডা প্রভাবই অনুমান করতে হয়। আমাদের কয়েকটি অনুসর্গ যে কোল-মুন্ডা-জাত তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে।

বাংলায় অনুকারাত্মক শব্দদ্বৈত ও মনোভাব-বাচক অব্যয়-জাতীয় শব্দের আশ্চর্য প্রকাশশক্তির বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ আমাদের গোচরে আনেন। এসবের অধিকাংশই সাঁওতালী ভাষায় ও অভিধানগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙলায় কর্মভাববাচ্যের গঠন সংস্কৃতের অনুরূপ নয়, হিন্দীতেও তাই (ধাতু + আ + জা, হ প্রভৃতি) সহায়ক কোনো একটি ক্রিয়া যোগে। এরকম সহায়তার ব্যাপারটি সাঁওতালী কানা, মেনা, তাহেকানা শব্দের বহুল প্রয়োগের সাদৃশ্যে আসতে পারে, যদিও সাঁওতালী কর্মভাববাচ্য নির্মাণে সহায়ক ক্রিয়া ছাড়া ওঃক্ প্রত্যয় যোগও পাওয়া যায়। সাঁওতালী কর্তৃবাচ্যে সাধারণভাবে কর্মের উপর জোর থাকে, ভাব-কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার উপর। বাঙলাতেও তাই। সাঁওতালীর প্রাণী ও অপ্রাণের মধ্যে পার্থক্য রাখার বিষয়টি বাঙলায় কারক-বিভক্তি প্রয়োগের মত কর্ম-ভাববাচ্যের রূপেও ফুটে উঠতে দেখা যায়। সংস্কৃত কর্মবাচ্যে মূল কর্মের উপর জোর পড়ে, কর্তৃবাচ্যে কর্তার উপর। সাঁওতালীতে অতীত বিষয়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বর্তমানের রূপও চলতে পারে। বাঙলায় এর অনুসরণ দ্রষ্টব্য। ব্যক্তিসম্পর্কহীন বাক্য, যেমন খিদে পেয়েছে, মাথা ধরেছে প্রভৃতি বাঙলার মত সাঁওতালীতেও লক্ষণীয়।

সাঁওতালী সংস্কৃত থেকে যেসব শব্দের ঋণ নিয়েছে তাতে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে সমীভবন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সর্বত্র পূর্বস্বরের দীর্ঘতা ঘটেনি। যেমন, বর্ধ, বৃদ্ধ = বড়াই বড়াতি। আদর্শ = আরসি। ভদ্র = ভীলাই। রাজ্ঞী = রানি। মনে হয়, এগুলি এমন সময় গৃহীত যখন মূল অ এবং আ এর একটা মাঝামাঝি উচ্চারণ প্রারব্ধ হয়েছিল। প্রাকৃতের আদি অবস্থায়ও তা-ই অনুমান করা যায়। বাঙলায় সর্ব = সাব না হয়ে 'সব' হয়েছে কেন তার কারণ সাঁওতালী প্রভাব হতে পারে।

সাঁওতালী বাক্যে ক্রিয়াপদ সবশেষে এবং কর্তা + কর্মাদি + ক্রিয়া এই পারম্পর্যই সাধারণ নিয়ম। বাঙলাতেও তাই। আবার এই সাধারণ নিয়মকে অতিক্রম করে যে-যে ক্ষেত্রে বাঙলায় পদবিন্যাসের ব্যতিক্রম দেখা যায় তা সাঁওতালীতেও সুলভ। কিন্তু কেবল বাঙলা কেন, এদিক দিয়ে সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে হিন্দী-ওড়িয়ার বিচ্যুতিও স্মরণীয়।

প্রশ্নাত্মক বাক্যে সাঁওতালীতে বাক্যের শেষভাগে জোরের সঙ্গে টান পড়ে। বাঙলাতেও তাই। যাবে তো ? যাবে না ?

মুন্ডারী বা সাঁওতালী মাত্রাসাম্যযুক্ত শ্বাসাঘাত-প্রবণ ভাষা। বাঙলার প্রতি শব্দে বা প্রতি গুচ্ছশব্দে শ্বাসাঘাত রীতি ওখান থেকেই। সংস্কৃতের উচ্চারণ রীতি হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রামূলক। প্রাকৃতের সাহিত্যিক ভাষাতেও প্রায় তা-ই, যদিচ তখনই শ্বাসাঘাত এবং অক্ষরে জোরের প্রথা উচ্চারণে প্রারব্ধ হয়েছে। সংস্কৃত-প্রাকৃত উচ্চারণ রীতিতে মাত্রা-প্রাধান্যের কারণে, ছন্দের ক্ষেত্রে যতি থাকলেও সে যতির স্থান গৌণ। উচ্চারণে শ্বাসাঘাত-রীতির ক্রম-আবির্ভাব আধুনিক ছন্দোবন্ধে (এবং গানের তালে) বিপ্লব এনেছে। প্রাচীন দীর্ঘ-হ্রস্ব-সুনির্দিষ্ট মাত্রামূলক রীতি থেকে অক্ষরমাত্রিক (এক অক্ষর বা সিলেবল্ = একমাত্রা) এবং যতি-বহুল শ্বাসাঘাত ছন্দের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

বাঙলায় বহু অ-তৎসম অ-তদ্ভব এবং ভিনদেশীয় নয় এমন শব্দ কোল-মুন্ডা মূল থেকে তিন চার হাজার বছর আগে থেকেই সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে এসেছে এবং কালে কালে এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধিই পেয়েছে। আমরা আন্দাজ করি আমাদের মত শিক্ষিতদের মুখে ভাষিত ঐরকম শব্দের সংখ্যা অন্তত চার পাঁচ হাজারের মত, আর গ্রামীণ চাষীবাসী সাধারণ জন মিলিয়ে অন্তত আট দশ হাজার। বৃত্তিকেন্দ্রিক বহু শব্দ,

জীবনধারণের সংলগ্ন ও মনোভাবসূচক শব্দ, গাছ--পালা, নিসর্গ বস্তুর নাম, গ্রামনাম, জীবজন্তুর না. এবং অনুকার-শব্দের অধিকাংশই সাঁওতালী অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে। বাঙলা অভিধানকারদের এমনকি ভাষাতাত্ত্বিকদের সামনে সাঁওতালী-মুন্ডারী অভিধান ব্যাকরণ না থাকায় ঐসব দেশী শব্দগুলিকে তাঁরা অবৈজ্ঞানিক রীতিতে একরকম জোর করেই সংস্কৃত-প্রাকৃতে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন ও করছেন। আমরা এখানে বাঙলায় বহু-প্রচলিত কিছু শব্দের নমুনা তুলে ধরছি যেগুলিকে কোনো সূত্র ধরেই সংস্কৃতে নিয়ে যাওয়া যায় না। এরকম শব্দ আরও অজস্র রয়েছে, গ্রামীণ শব্দ ধরলে তো কথাই নাই।

আপনি। মধ্যম পুরুষের সম্মানবাচক শব্দ। নিজার্থবাচক 'আপন' থেকে এ সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং আত্মন্ শব্দ থেকে এর ব্যুৎপত্তি টানা যাচ্ছে না। আমাদের অধ্যয়নে সাঁওতালী মধ্যম পুরুষের বহুবচনের 'আপে' এবং নির্দিষ্টতা-বোধক 'হুনি' শব্দের যোগেই মধ্যযুগের 'আপুনি' এবং বর্তমানের 'আপনি' এসেছে। হিন্দী ঐ হুনি-যোগ ছাড়াই 'আপ' ব্যবহার করছে।

আঁটানো। সাঁওতালী 'আঁটাও' অর্থে যথেষ্ট হওয়া।

আনাড়ি। 'অনভিজ্ঞ' থেকে জোর করে টানা যাচ্ছে না। 'নাই নাড়ী' ব্যুৎপত্তিও হাস্যকর। আসলে আনাড়ি সাঁও শব্দ। অর্থ-অজ্ঞ।

ইয়ে। স্মরণবোধক অব্যয়। ফারসী এয়াদ্---হিন্দী ইয়াদ, সাঁও ইয়ে, বাঙলা ইয়ে আসতেও পারে।

ওলা (ওলা-উঠা)। সাঁও অর্থ বমন। শব্দটি যদি সংস্কৃত উদ্ + গল থেকেই মুন্ডারীতে এসে থাকে, তবে তা অতি প্রাচীনেই ঘটে থাকবে। তাছাড়া গল্ গলা (স্বর) মূলে মুন্ডারী শব্দ হতে পারে। বাঙলায় উদ্ + গৃ জাত উগারে, ওগরায়ই অধিকতর প্রচলিত শব্দ।

আচমকা। মূল সাঁও আচকা। অর্থ হঠাৎ। চমক শব্দের সঙ্গে মিশ্রণে কেবল কোলকাতা কেন্দ্রে আচমকা।

সাঁও আলগা। প্রাকৃতে হলক্ক পাওয়া যায়। বৈয়াকরণেরা আন্দাজে লঘু শব্দ থেকে তার ব্যুৎপত্তি ধরেছেন। বাঙলায় এ থেকে এসেছে হালকা। সাঁও হালকা। 'আলগা' এ থেকে অনেকটা পৃথক্। অর্থ সহজ, শিথিল। সং অলগ্ন (হিন্দী অলগ) শব্দের সঙ্গে মূলে এর যোগ ছিল কিনা তা এখন নির্ণয় করা যায় না। তেমনি সাঁও বেলক্ = পৃথক, বাঙলা গ্রামীণ বেলগ = পৃথক্ ফার্ বে + অথবা সংস্কৃত বিলগ্ন--জাত কিনা ভাবতে হবে।

আল। মধ্য বাঙলায় কৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাচ্ছে। আল রাধা, আল বড়ায়ি ইত্যাদিতে নিষেধ বা আক্ষেপে প্রয়োগ। সাঁওতালীতেও তাই।

উন্টা। সাঁওতালী। বাঙলার সমার্থক।
ওৎ। সাঁও ওৎ = সুযোগ।

আড়। সাঁও আড়। অর্থ দেওয়াল, ব্যবধান, পর্দা। বাঙলা আড়াল ঐ আড় + অন্তরালের আল যোগে। তা ছাড়া কেবল 'আড়' শব্দের প্রয়োগও রয়েছে। 'আড়গড়া' শব্দের আড় ও গড়া দুই-ই সাঁওতালী। অর্থ প্রাচীর ঘেরা গোয়াল। গোরুর গোয়ালে প্রাচীর দেওয়ার রীতি প্রায়শই থাকত না। অশ্বশালে প্রয়োজনীয় ছিল। কবিকঙ্কণের কাব্যরচনার গ্রামের নাম আড়রা। আসল শব্দটি হল আড় + অড়া (ওড়াঃক্ = গৃহ)। অর্থ প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ যে গ্রামে। জমিদার রঘুনাথ রায়ের প্রাচীর বেষ্টিত গৃহের ভগ্নাবশেষ আজও রয়েছে। শব্দের শেষে ড়া অর্থাৎ অড়া যোগ বাঁকুড়ার (বাঁকু + অড়া) বহু গ্রামেই রয়েছে। খাতড়া = ক্ষত্র + অড়া, রাওতড়া = রাউত + অড়া। রাউত = রাজপুত্র = পুলিস অফিসার।

সেঁদড়া = সেন্দ (সাঁও অর্থ শিকার) + অড়া। অর্থ শিকারের অস্ত্রশস্ত্র আয়োজনের গ্রাম ইত্যাদি। সাঁও 'আড়ে' শব্দ থেকে আলি = আ'ল এর উদ্ভব। আর আড় = দেওয়াল + সং শলভ = আরশুলা।

আর। এবং অর্থে। তুমি আর আমি। 'এ ছাড়া' এমন অর্থে নয়। উক্ত অর্থবাচক 'আর' = কু--কী আঅর নিশ্চয়ই সং অপর শব্দ জাত।

কাকা। মামা। চাচা। তৃতীয়টি মজার। সচরাচর বাচ্চাদের হাঁটতে শেখাতো কাকারা। চা--চো (চই চই পা পা) অর্থ বাচ্চাদের প্রথম পা-ফেলা। এই কারণে কাকা'র আর এক আখ্যা চাচা।

আই। সাঁও আইয়ো, অর্থ 'মা'। 'আর্যা' = বৃদ্ধা শব্দ থেকে জাত অথবা অবিধবা শব্দের কোনো যোগ এর সঙ্গে আছে মনে হয় না। মধ্য বাঙ্ আই = মাতা। শচী আই।

আটকাল। অর্থ অনুমান, বোধ হওয়া। কাঁথ। সাঁও কাঁত। অর্থ মাটির দেওয়াল। পশ্চিমবঙ্গে শব্দটি আজও জীবন্ত। নূন প্রস্তুত করার জন্য তোলা কাঁত থেকে কাঁথি, অথবা কাঁথ = নোংরা, ময়লা থেকে কাঁথি, কাঁথা।

কুড়ানো। কুড়ি। সাঁও কোডো = কোমর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করা। ঐভাবেই মাটির উপর থেকে তুলে নিতে হয়। বিশ অর্থে 'কুড়ি' ঐভাবে মাথা নিচু করে হাতের আঙুল ও পায়ের আঙুল দেখিয়ে সংখ্যা বোঝানো থেকে এসেছে এমন মনে হয়। সাঁও কুড়া = পাওয়া, লাভ করা। হয়ত ঐ শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কুড়ানোর রূপ নিয়েছে।

কুলানো। সাঁও কুলী = যথেষ্ট হওয়া।

খাড়া (হওয়া, করা)। সাঁও খাড়া = প্রস্তুত হওয়া, প্রস্তুত করা, গ'ড়ে তোলা।

খাটো। লম্বায় কম। অভিধানগুলিতে জোর করে 'কষ্ট' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি ধরা হয়েছে।

ছাই। সাঁও অর্থ - মিথ্যা। বাঙলাতেও মূল অর্থে তা-ই। পরে ছাই-পাঁশ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে। অভিধানগুলিতে 'ক্ষার' শব্দ থেকে !

ছুঁচা, ছুঁচো। সাঁও অর্থ হীন, জঘন্য। পরে প্রাণীতে ঐ অর্থ আরোপিত হয়েছে। বাঙলায় দুই অর্থেই ব্যবহার দেখা যায়।

খুলা, খোলা। সাঁও খুলী, খুলা = অবাধ, মুক্ত, স্পষ্ট, সুন্দর। দরজা খোলা, খোলা মন, রঙ্ খুলেছে।

খালি। সাঁও খালি = ফাঁকা, কিছু না থাকা। খাল = জল থাকে এমন গভীর খাত। ফাঁক, ফাঁকি আরবি থেকে, কিন্তু ফাঁদ, ফাঁস, ফাঁসি সাঁওতালী।

খানখা, খামখা। বিনা কারণে। হিন্দী অনোখা।

খাওয়া = খা = ফোঁস করা, ফোঁপানো। মার খাওয়া, বকুনি খাওয়া ইত্যাদির খা ঐ শব্দ থেকেই এসেছে মনে হয়। তা ছাড়া সাঁও খাবা শব্দের অর্থ দেহের মধ্যে পিচ্কারি মত ক'রে কিছু অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। সুতরাং 'সাপে খাওয়া'।

খাঁক (খাঁকতি)। সাঁও অর্থ লোভী, পেটুক, যার চাহিদা বেশী। লোকটার খাঁক বেশী। খাঁকতি = কম পড়া। কমতি। শূন্যতা। ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত লোভের ফলে জিনিস বাজারে কম পড়ে যায়। বাঙলায় সম্প্রতি ঐ কমতি শব্দের প্রভাবে খাঁকতি 'খামতি' হয়ে দেখা দিচ্ছে।

কুলি। শব্দটি দ্রাবিড় থেকে সাঁওতালীতে ঢুকেছে কিনা ভাবতে হবে।

ডেঙ্গু। ডেঙ্গু জ্বর। সাঁও ডাঙ্গুয়া = অবিবাহিত। সংক্রামক জ্বর বিশেষে অবিবাহিতদেরই আক্রমণ করেছিল তাই ডেঙ্গো জ্বর। এখনও পশ্চিমবঙ্গে - না, বিয়া করবোক নাই, ডেঙ্গুয়া থাকবোক।

বানবাঁসি। অর্থ প্লাবন। বর্তমান বাঙলায় বানভাসি।

বানচাল। সাঁও নিষেধার্থক বাঙ + চালাঃক্ । মূল অর্থ—যাওয়া নিষেধ।

দৌড়। সং 'দ্রব' তুলনীয়। ছোট। ছুটি (অবকাশ)। মানা = নিষেধ। বাঙলায় বহুপ্রচলিত।

ভরসা (= আশা)। ভেস (= ভেক্)। ডমরু (ডম্ = ডোম + রু = আঘাত করা)। চাউল = সাঁও চাওলে। চিড়িয়া = সাঁও চেঁড়ে। চড়ক (শিব-উৎসব)। গাছের চারদিকে ঘোরা। চুল্লী। তোলা (উপরে ওঠানো)। ঝরনা। টাকু। চরখা। নেকড়া। দাদা। ধরাট। নেংটি (ইঁদুর)। দল (গোষ্ঠী)। ডাঁট, ডাঁটা (ক্রিয়া)। ফেলা, ফুলা। ফাঁদ। নড়ানো। ভার, ভর। বাঁচা (রক্ষা পাওয়া)। বড়কি ছুটকি (= বড় সতীন ছোট সতীন)। বাছা = নির্বাচন করা। পাটিয়া, পাটী (= পঙক্তি, শ্রেণী, মাদুর)। বাবু (= পুত্র)। ভুল। ভাও। বেঁক (একজাতীয় পায়ের মল)। ভেড়া। ভেদ (= অর্থ)। ময়লা। মোটা। মেলা (= গৃহ সংলগ্ন বসার স্থান)। মোচা (= মুখ)। সেঁক (= সাঁও সঙ্গেল = আগুন) বাড়ানো (পা বাড়ানো)। বির = জঙ্গল (বিরভূম)। ঢেঁকি (= ঢিঁকি)।

পয়সা - সাঁও পোএসা। সং পোত = পো + সাঁও 'সা' = নিকটে, গায়ে। ছেলেদের রোগ নিবারণে কোমরে তামার গোলাকৃতি বস্তু সুতোয় পরিয়ে রাখা হয়, তা থেকে।আখা = উনান। সাঁও আঁছিয়া = উনানের মুখ।

ভেজা = পাঠানো। গলি, গলিয়ে দেওয়া = সুতো প্রভৃতি ঢোকানো সংলগ্ন সরু ফাঁক।

মারা। চাল মারা, ফাঁকি মারা, পকেট মারা ইত্যাদি। শব্দটি সাঁওতালীতেই ঐরকম যাবতীয় হীনার্থে প্রযুক্ত। তেমনি উপবেশনের 'বসা'র মূল সং। কিন্তু স্কুল বসা, হাট বসা এবং দাগ বসা, দাঁত বসা -- এ দুই 'বসা' দু'টি ভিন্ন সাঁও শব্দ থেকেই।

নীট। অর্থ নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত, যেমন, নীট পাঁচ টাকা লাগবে। ইং net শব্দের অর্থ ভিন্ন। আচার্য সুনীতিকুমার ইং শব্দ ধরে বলেছেন -- সেদিন আগত নেট্ এর 'এ' টা কিভাবে 'ই' হল এ একটা ধাঁধা। আসলে এটি সাঁও শব্দ।

এরকম অজস্র। এগুলি সংস্কৃত প্রাকৃতে নিয়ে যাওয়া যায় না। সাঁওতালী ভাষায় আমার ঠিক গুরু-দীক্ষা নেই। দীক্ষিত হওয়ার সময় চলে গেছে। অভিধান ব্যাকরণই আমার সম্বল। বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কোনো ছাত্র সাঁওতালী মুন্ডারী ভাষা শিখে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারলে বিষয়টি আরও সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতির সঙ্গে জানাতে পারবেন মনে করি। বাঙলা আকাদেমির এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

বাঙলা-সাঁওতালি ভাষা-সম্পর্ক

ক্ষুদিরাম দাস

পশ্চিমা ও পূর্বী নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিকেরা এবং তাঁদের সমান্তরালে প্রত্নবিৎ ও ভাষাবিজ্ঞানী আর্যপূর্ব সুপ্রাচীন ভারতের জাতিগত ও ভাষাগত একটা নির্ভরযোগ্য মানচিত্র খাড়া করেছেন। এঁদের মধ্যে খুচরো নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত মিলেছে, তা এই যে, আর্যপূর্ব ভারতে তিন মূল নৃগোষ্ঠীর মানুষ বহুদিন ধরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এঁরা হলেন, এক, অস্ট্রিক বা কোল-মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ, দুই, দ্রাবিড়ভাষী, এবং তিন, হিমাচল-পূর্বার্ধ সংলগ্ন মূল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর ভোট-চীনা শাখার মানুষ। এদের মধ্যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা বা সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নিষাদদেরই অনেকে সর্বপ্রাচীন অধিবাসী ব'লে নির্ধারণ করেছেন। ভাষায় এবং আকৃতিতে এই তিন শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত বিভিন্ন হলেও পাশাপাশি বসবাস করতে অভ্যস্ত থাকায় এঁদের মধ্যে ভাষা ও আচারগত মিশ্রণও কিছু কিছু হয়ে থাকবে। বিশেষে কোল মুণ্ডা ও দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের যে কবিতাংশে তিন-শ্রেণীর অন্-আর্য মানুষের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে (প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুঃ) তাঁরা উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর কিনা বোঝা যায় না, সম্ভবত নয়, কারণ ঐ অংশের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে যে তাঁরা হলেন বঙ্গবাসী, মগধবাসী ও চেরপাদ্যেরা—প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি বা বৈ তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ। বেদের টীকাকার সায়ন যজ্ঞাদি বিষয়ে প্রামাণ্য পণ্ডিত হলেও উক্ত অংশদুটির মধ্যেকার 'অত্যায়' 'বয়াংসি' এবং 'চেরপাদাঃ' শব্দের অভিপ্রেত বাচকতা পরিগ্রহ করতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় অত্যায় হ'ল প্রবল এবং বয়াংসিও হ'ল প্রবলতাযুক্ত। আর চের ও পাড = পাদ হচ্ছে 'পাণ্ড্য' তখনকার মুণ্ডাগোত্রের এবং অস্ট্রাল-নিগ্রো শাখার মানুষ, যাঁরা পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্রাবিড়ভাষীদের সঙ্গে বহুলাংশে একীভূত হয়ে পড়েছেন, পণ্ডিচেরী তালচের প্রভৃতি স্থাননামে আজও যার সাক্ষ্য মিলছে। টীকাকার সায়ন কেবল ধর্মীয় ব্যাপার মাথায় রেখে খুশীমত সন্ধি-বিচ্ছেদ ক'রে তাঁর উদ্ভট ব্যাখ্যায় বলেছেন যে বঙ্গ-মগধের অধিবাসীরা বেদবিহিত মার্গ অনুসরণ না করার জন্য পাখী ও সাপ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে দেখা যায় যে, মগধ, বঙ্গ এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ধ'রে চের-পাণ্ড্যদের অঞ্চলে 'আর্য' প্রভুতার বিস্তারে বেশ কিছু বিলম্ব ঘটেছে।

বাঙলার পক্ষে দেখা যায়, জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকেরা অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দে এবং মৌর্য অধিকারে সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষা নিয়ে বৌদ্ধ ও

ব্রাহ্মণ্য বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরা প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করছেন। মূল কোল-মুণ্ডার শাখা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে ঐ সাঁওতাল-অধ্যুষিত বাঙলায় বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রশাসন ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে যে সমাজ-বিপ্লব ও ভাব-বিপ্লব প্রারব্ধ হয়েছিল তার ইতিবৃত্ত নেই, তবে অনুমান দুরূহ নয়। পাঞ্জাব সিন্ধুদেশে আর্য অনুপ্রবেশের সময় সুমের-এসিরিয় কালদীয় সংলগ্ন দ্রাবিড়ভাষীদের সঙ্গে আর্যদের যে ধরনের প্রবল সংঘাত ঘটেছিল এবং যার ফলে দ্রাবিড়ভাষীরা পাঞ্জাব থেকে বেলুচিস্তানে ও দাক্ষিণাত্যে বিতাড়িত হয়েছিলেন, তেমন কিছু সংঘাত মগধ-বাঙলায় হয়ত ঘটেনি, অন্তত তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। শান্তিপ্রিয় কোল-মুণ্ডারা এই নোতুন বিপর্যয়ের সঙ্গে যথাসম্ভব মানিয়ে নিয়েছিলেন এমনটাই সম্ভব। তাছাড়া মৌর্যদের সুশিক্ষিত সৈন্যশক্তির কাছে কোল-মুণ্ডারা কতটা অসহায় ছিল তার একটা প্রমাণ—অনায়াস হত্যালীলার সঙ্গে অশোকের কলিঙ্গ বিজয়। যাই হোক, আগেকার দেড় হাজার বছরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য-অনার্য পরিস্থিতিতে যা ঘটেছে, মগধ-বাঙলায় প্রায় নির্বিবাদে তা-ই ঘটল, অর্থাৎ নিষাদ বংশের অনেকেই তখনকার অনার্য-মিশ্র আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে আত্মদান করলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের অধীনে কর্মচারী, কৃষক ও মেহনতী মানুষ হিসাবে কাটাতে লাগল অথবা বৃত্তি ধ'রে হীনবর্ণ আখ্যা নিয়ে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করতে লাগল। যারা মিলতে পারলে না তারা ছোট-নাগপুর, ওড়িশা, মধ্য-প্রদেশের অরণ্য-পর্বত আশ্রয় ক'রে আগেকার মত স্বাধীন জীবন কাটাতে লাগল। আজকের যাঁরা বাঙালী, কী হিন্দু, কী মুসলমান, তাঁরা মুখ্যভাবে ঐ কোল-মুণ্ডা সাঁওতালদেরই বিমিশ্র বংশধর। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ অধিকৃত এই পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্র-সমাজে বিজেতাদের যে প্রতাপই চলতে থাকুক, পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যম যে ভাষা, তার ক্ষেত্রে সংস্কৃত-প্রাকৃতকে এবং কালক্রমে উদ্ভূত হিন্দী ভোজপুরী ও বাঙলা-ওড়িয়াকে মুণ্ডারি ও বিশেষে সাঁওতালী প্রভাব স্বচ্ছন্দে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে, বিমিশ্রিত জীবনধারণের স্বাভাবিক নিয়মেই। যেমনটা ঘটে এসেছে পশ্চিম ভারতে এর আগেই। এই কারণে বাঙলা তথা হিন্দী ওড়িয়ায় কেবল উচ্চারণে ও শব্দেই নয়, প্রত্যয়াদি এবং বাক্‌রীতিতেও এমন সব প্রয়োগ মিলছে, সংস্কৃত-প্রাকৃত ধ'রে যেগুলির ব্যাখ্যা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এমনও বলা যেতে পারে যে শব্দে প্রত্যয়ে বাক্যগঠনে ছন্দোবিন্যাসে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতির সংস্কৃত থেকে যেখানে যেখানে বিচ্যুতি তার বেশ কিছু পরিমাণ আমাদের নিষাদবর্গীয় মুখ্য পূর্বপুরুষদের ভাষারই অবদান।

বাঙলায় সাঁওতালী শব্দ-প্রত্যয়াদি যা যা গৃহীত হয়েছে তার নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়ে দেখা যায়, স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাঙলার সঙ্গে সাঁওতালির অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নেই। যেমন, সাঁওতালির অ + জিভ-ওলটানো সংক্ষিপ্ত উ এই দ্বিস্বর বাঙলায় নেই। তাছাড়া নেই কদাচিৎ শব্দান্তে উচ্চারিত ক্, চ্

ত্, প্ এর একটা রেশ, যেন ব্যঞ্জনটা উচ্চারণ করতে গিয়ে আটকে গেল : এও বাঙ্‌লা উচ্চারণে নেই, ওড়িয়া-হিন্দীতেও নেই। অ+উল্টো উ যুক্ত যে-সব সাঁওতালি শব্দ বাঙ্‌লায় এসেছে সেগুলিকে আমরা প্রায়শঃ 'আ' ক'রে নিয়েছি। আর শব্দান্তের আটকানো ব্যঞ্জনগুলি উচ্চারণে লোপ ক'রে দিয়েছি। আধুনিক ভাষাগুলির নোতুন স্বর 'এ্যা' কোল-মুণ্ডা ও দ্রাবিড় দুই ভাষাতেই দেখা যায়। সেখান থেকেই আমরা নিয়েছি। সাঁওতালি অ আ এর উচ্চারণ হিন্দীর কাছাকাছি। বাঙ্‌লার 'অ' এর পর ই-উ উচ্চারিত হ'লে সেই অ যেমন অনেকটা 'ও' উচ্চারণে গিয়ে দাঁড়ায় সেরকম প্রবণতাও সাঁওতালিতে নেই। বস্তুতঃ বাঙ্‌লা ই-উ উচ্চ স্বর, কিন্তু সাঁওতালি ই-উ সু উচ্চ। বলা যেতে পারে যে, ই উ এর ছোঁওয়ায় বাঙ্‌লা অ এর ও-বিকৃতি আজ থেকে খুব বেশিদিন আগে প্রারব্ধ হয়নি। তাছাড়া এও লক্ষ্য করা যায় যে, যদিও সাঁওতালিতে অনুনাসিকের উচ্চারণ আছে, তবু অনুনাসিক-যোগে উচ্চারিত হয়নি এমন কিছু শব্দ বাঙ্‌লায় অনুনাসিক যোগেই উচ্চারিত হয়। ন্ এর সঙ্গে ট, ঠ প্রভৃতির যোগে বানানের ণ আধুনিক বাঙ্‌লায় ন্ উচ্চারিত হয়। প্রাচীন বাঙ্‌লায় ওর উচ্চারণ 'ণ' ছিল এমনই আমাদের অনুমান। তা ছাড়া ম্+হ, ন্+হ সাঁওতালির সঙ্গে এ বিষয়ে প্রাচীন বাঙ্‌লারই মিল। আধুনিক বাঙ্‌লা ওসব থেকে সরে এসেছে। সাঁওতালিতে বাঙ্‌লা হিন্দী ওড়িয়ার মত য-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতি আছে। পর পর দুই স্বরের মাঝখানে তা উচ্চারিত হয়। অ+ই এবং অ+উ মিলে অয়ি অয়ু উচ্চারিত হয়, ঐ ঔ নয়। এছাড়া বাঙ্‌লা ধ্বনি-সংগতি বা সন্ধির নিয়মে যেমন স্বর-বর্ণের পর ক চ ট ত প—গ, জ, ড, দ, ব হয়ে যায় সাঁওতালিতেও তাই। কদাচিৎ বাঙ্‌লার মত অন্যান্য সন্ধিও দেখা যায়।

অতঃপর আমরা বাঙ্‌লায় প্রচলিত কিছু সাঁওতালি শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখাচ্ছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হচ্ছে যে, কেবল বড় বড় প্রচলিত অভিধানগুলিতেই নয়, কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের লেখাতেও ভাষা-বিজ্ঞানের নিয়মের বাইরে গিয়ে জোর ক'রে ঐ শব্দগুলির সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি খাড়া করার চেষ্টা চলছে। কণ্ট থেকে 'খাটো' প্রাস (=বল্লম) থেকে 'ফাঁস', ক্ষার থেকে 'ছাই', প্রের থেকে ফেল্, স্থাবর থেকে ঠাহর, নেত্র থেকে ন্যাতা, ইং নেট্ থেকে নীট্ (=স্থির, সঠিক) এরকম বহু উদ্‌ভট ব্যুৎপত্তি ছাপার অক্ষরে দেখা যাচ্ছে। প্রচলিত বহু বাঙ্‌লা শব্দের উৎসরূপে মুণ্ডারি বা সাঁওতালি লক্ষ্য করতে গিয়ে সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে উচ্চারণে ও গঠনভঙ্গিতে বাঙ্‌লায় বিবর্তনের যে রূপরেখা আচার্য সুনীতিকুমার বৈজ্ঞানিক রীতিতে নির্দেশ করে গেছেন তা আমাদের সতত স্মরণে রাখতে হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়টিও ভেবে দেখতে হয়েছে যে, সুদূর অতীতে কোল-মুণ্ডাদের ভাষার সঙ্গে যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃতের তেমনি দ্রাবিড়ভাষীদেরও শাব্দিক আদান-প্রদান ঘটেছে, যার স্বরূপ নির্ণয় আজ সর্বাংশে অসম্ভব। এও

দেখতে হয়েছে যে, চলমান হিন্দী, বাঙলা, ওড়িয়া থেকে সাঁওতালিতে বহু তদ্ভব শব্দ তথা ফারসী, ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মিশনারিদের নির্মিত সাঁওতালি অভিধানগুলির দৃষ্টান্তে এসব নিয়ে কোল-মুণ্ডাদের বেশ পরিপুষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে অধুনা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক বঙলা তথা হিন্দির দুই বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত 'আপনি-আপন' বা 'আপ' শব্দ। নিজার্থে আপন-আপনা শব্দ অবশ্যই সংস্কৃত আত্মন্ থেকে; কিন্তু 'তুমি' শব্দের সম্মানবাচী আপনি-আপ শব্দ? এর সমাধান সংস্কৃত-মূলে পাওয়া যাবে না। সাঁওতালিতে সম্মানবাচক সর্বনামের ব্যবহার নেই, কিন্তু তুমি শব্দের বহুবচনে রয়েছে 'আপে' এবং বিশিষ্টার্থক রূপে রয়েছে 'হুনি'। মধ্য বাঙলার এবং এখনও প্রচলিত গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের ভাষার 'আপুনি' শব্দ ঐ আপে এবং হুনির যোগেই তৈরি হয়েছে ও বর্তমানে রূপ নিয়েছে 'আপনি' এ স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঐ হুনি-যোগ হিন্দীতে প্রয়োজনীয় হয়নি, আপে='আপ' শব্দেই ভবান্ এর অর্থ বোঝাচ্ছে। হিন্দীতে এ্যায়সা, জ্যায়সা প্রভৃতিতে 'সা' প্রত্যয় দেখা যায়। প্রাচীন-মধ্য বাঙলায় ঐ 'সা' 'সন' রূপেও দেখা যায়, 'ছে' রূপেও পাওয়া যায়। কৈসন-কৈছে, জৈসন-জৈছে। এর মূল 'সদৃশ' শব্দ ধরলে স্বাভাবিক সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ 'সদৃশ' প্রাকৃতে সরিস বা সরিচ্ছ রূপে দেখা যায়। অথচ সাঁওতালিতে 'সা' শব্দের অর্থ দেখছি 'পুরোপুরি, সর্বাংশে'। সুতরাং অনুমান করতে হয়ে যে ঐ 'সা'ই সন, ছন, সা, সে, ছে প্রভৃতির রূপ নিয়েছে। সাঁওতালিতে 'সা-এ' ব'লে আর একটি শব্দ আছে, যার অর্থ—ধারে, পাশে, গায়ে। এটা জানার পর বাঙলা-হিন্দীর 'পয়সা' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া গেল। মধ্য হিন্দী এবং সাঁওতালিতে পয়সা—(পোএসা) অর্থাৎ 'পো'-এর (পোত=শিশু) কাছে বা গায়ে যা দেখা যায়। বাচ্চাদের কোমরে ঘুনশির সঙ্গে একটা গোলাকার তাম্রখণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া চিরাচরিত পদ্ধতি। তাম্র খণ্ডের মুদ্রারূপে বহুল প্রচলন হলে ঐ নাম সহজেই প্রবর্তিত হতে লাগল। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, সংখ্যাবাচক 'কুড়ি' শব্দের মূল পাওয়া যাচ্ছিল না। সাঁওতালিতে কুড়ি, হো-দের কুই শব্দের অর্থ হ'ল বালিকা। ঐ সূত্র থেকে বিশ অর্থে কুড়ি শব্দ আসেনি। এসেছে অন্য শব্দ থেকে একটু ঘুরফিরের মধ্য দিয়ে। বাঙলায় 'কুড়ানো' ক্রিয়াপদ রয়েছে যার দ্যোতনা হ'ল কোমর ভেঙে দেহের ঊর্ধাংশ নিচু ক'রে মাটি থেকে কিছু তুলে নেওয়া। সাঁওতালিতে রয়েছে 'কোডো' শব্দ, যার অর্থ—কোমর বেঁকিয়ে দেহটাকে নিচু করা। তা ছাড়া 'কুড়ি' সংখ্যা প্রকাশ করতে ওদের হাতের দশ আঙুল ও পায়ের দশ আঙুল দেখাতে হ'ত। এইভাবে কুড়ানো এবং কুড়ি শব্দের সূত্র পাওয়া গেল। এমনিই গোলমেলে ছিল আমাদের 'সত্যপী'র শব্দের 'সত্য'টার অর্থ। একই ব্যবহারে সাঁওতালিতে পাচ্ছি "সতোঃক্ পীর"। সতোঃক্

শব্দের অর্থ হ'ল—শরণ গ্রহণ করলে যে দেবতা প্রসন্ন হয়ে বর দেন, আর না নিলে যিনি বিপদে ফেলেন এমন। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগুলির যেরকম স্বভাব। সত্যপীরের পাঁচালিতে মঙ্গলকাব্যের ঐ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সুতরাং সাঁওতালি থেকে আমাদের অপরিচিত সতোংক্ শব্দকেই পরিচিত ক'রে নিতে গিয়ে আমরা 'সত্য' করে নিয়েছি। বাড়া অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্য তদ্ভব, কিন্তু ভাত 'বাড়া'? এটি সাঁওতালি অর্থ পাত্রের উপর রাশীকৃত করা। [illegible] 'ফাঁকি' শব্দের অর্থ গুঁড়ো ওষুধ—যে নাম এখনও কবিরাজি প্রয়োগে আছে। সাঁওতালিতে ছাই' শব্দের অর্থ 'মিথ্যা'। এর সংস্কৃত প্রাকৃত মূল পাওয়া যায় না। বাঙলায় ছাই' অর্থে মিথ্যাও বটে (তুং দিবে, না, ছাই। হবে, না ছাই) ছাই-পাঁশও বটে। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। তেমনি 'ছুঁচো' শব্দ। সাঁওতালিতে এর অর্থ-হীন, সংকীর্ণ, জঘন্য। বাঙ্লাতেও তাই (ছুঁচো কোথাকার), আকার সংক্রমণ বশে ঘৃণ্য জীবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত 'প্রের' থেকে 'ফেল্' কখনোই আসতে পারে না। এখনকার ফেল্ স্থানে মধ্য বাঙ্লায় পেল্ ধাতুর ব্যবহার দেখছি। সাঁওতালিতে পেল্ শব্দের অর্থ একই, নিক্ষেপ করা। আধুনিক বাঙ্লায় পাই যেমন, তেমন। এদের এ, জে, তে শব্দ সংস্কৃতের এতদ্ যদ্ তদ্ শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মন? আসলে মধ্য বাঙ্লায় পাই জেমতি তেমতি। এবং জেনমত, হেনমতে। সাঁওতালিতে উদ্দেশ্যবাচক শব্দ 'মেত্তে' এবং 'মাতে' থেকেই অর্থ পরিবর্তনে ঐ দু'টি শব্দ তদ্ভব সর্বনামের সঙ্গে আমরা যোগ ক'রে নিয়েছি। বাঙ্লা অনুসর্গ 'পারা' এবং 'পানা'র মূল সংস্কৃত প্রায় এবং প্রাণ থেকে ধরা যেতে পারে, কিন্তু 'থেকে' অনুসর্গ (অপাদান-বাচক) 'স্থা' অথবা 'স্তম্ভ' এমন কষ্ট কল্পনা করা উচিত হবে না। বরং সাঁও° 'তাহেকান্' থেকেই সম্ভাব্য। দেখতে হবে যে বাঙ্লায় ভিন্ন শব্দ তা অনুসর্গের যোগে কারক-নির্দেশের প্রবণতাই সমধিক। এ বিষয়ে বাঙ্লা সাঁওতালির সগোত্র। লোকমনস্তত্ত্বের সহজিয়া স্বভাবে শব্দার্থ নানাদিকে বাঁক নিয়ে থাকে। আত্মপ্রকাশের তাগিদে নানা ভাবে উপাদান সংগ্রহ করে। প্রাকৃত-যুগের সংস্কৃত-বিচ্যুতির মুখে কোলমুণ্ডা গোষ্ঠীর ঐসব শব্দ ও প্রত্যয় বাঙ্লা-হিন্দী-ওড়িয়ার প্রকাশরূপ নির্ধারিত করেছে। পাঁশুটে, তামাটে এদের 'টে' প্রত্যয়কে 'টিয়া' মনে করলে তারও মূল ধরা যাবে না। আসলে ওটি সাঁওতালিতে পাওয়া 'কতকটা সেই ধরণের' এই অর্থবাচক 'টে' থেকেই এসেছে। তেমনি ছেলেমি, পাকামি, দুষ্টামি প্রভৃতির আমি, মি এসেছে সাঁওতালি 'আমিঞ্' শব্দ থেকে, যার অর্থ—সবদিক দিয়ে।

নিচে আমরা সাঁওতালি থেকে পাওয়া আরও কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি।

'আছাড়'=মাটিতে পড়ে যাওয়া। এটি 'কাছাড়' শব্দের ক'লকাতা-কেন্দ্রিক

নবরূপে। সাঁওতালিতে 'কাছড়াও' শব্দের অর্থ হচ্ছে চেপে ধরে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করা অথবা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যাওয়া। সংস্কৃত 'অঙ্গপাত' শব্দ তৈরি করলে ঐ অর্থ আসবে না। সাঁওতালির 'আছাড়' শব্দের অর্থ জোর বৃষ্টি, যার সঙ্গে সং আসার শব্দের যোগ তুলনীয়। আর সাঁও 'আছড়া' শব্দের অর্থ তৈরি করা নরম মাটিতে বীজবপন। এ শব্দটি আজও গ্রামে প্রচলিত। বাঙলা 'আখা' শব্দ, অর্থ উনান। সংস্কৃতের নানার্থক 'অক্ষ' শব্দ থেকে কোনো ভাবেই উনান বা অগ্নি অর্থ আনা যাচ্ছে না। রশ্মি এবং গৌণার্থে তাপ ধ'রেও নয়। আমরা অনুমান করি সাঁওতালি 'আছাই'। (=উনানের মুখ) শব্দই ওর সম্ভাব্য উৎস। 'ঠিক' শব্দ 'স্থির' থেকে কদাপি আসতে পারে না। এটি সরাসরি সাঁওতালি থেকে নেওয়া সাঁওতালি শব্দই। পুকুরের 'পাড়' শব্দ। অনুরূপ কাপড়ের পাড়ও। অর্থ উঁচু বর্ডার। শব্দটি সং পার + সাঁও আড়ে, আড় (=উঁচুস্থান, আশ্রয়, লুকানোর স্থান) যোগে এসেছে। তেমনি ঘরের 'চালা'র পাড়, যার সঙ্গে উপরের বর্গাগুলি লাগানো থাকে, তারও মূল সাঁওতালি। আবার 'পাড়ি' 'পালি' এসবের মূলও সাঁওতালি। পাট, পর্যায় প্রভৃতি শব্দ অন্তত এক্ষেত্রে কল্পনা করে লাভ নেই। আমাদের যাত্রা পাঁচালিতে 'পেলা' দেওয়ার প্রথা আছে। সাঁওতালিতে ওর অর্থ উপহার স্বরূপ হাতে কিছু গুঁজে দেওয়া। পেল্ =ফেলে দেওয়া নয়। তেমনি প্যাঁড়া সন্দেশ—সাঁও পেড়া (=নাক চোখ বসানো মিষ্টান্ন)। মারা =প্রহার করা পরবর্তী সংস্কৃতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 'চাল মারা' 'পকেট মারা' 'টাকাটা মেরে দিলে' প্রভৃতির মারা হীনার্থক সাঁওতালি শব্দই। সাপে 'খাওয়া'। এ খাদ্ ধাতু থেকে আসতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতে দন্শ্ ধাতু রয়েছে। অথচ দেখছি সাঁওতালিতে 'খা' শব্দের অর্থ ফোঁস করা, আর 'খাবা' =তরল পদার্থ দেহে প্রক্ষিপ্ত করিয়ে দেওয়া। বাঙলা 'পানসে' শব্দ, অর্থ ভঙ্গুর। পানুসে দাঁত। শব্দটি এসেছে সাঁও 'পানিছা' থেকে। সাঁওতাল শিশুরা কঞ্চি দিয়ে ধনুক ও কঞ্চিরই চটা দিয়ে ধনুকের ছিলা তৈরি করে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে। আমরাও বাল্যকালে তা করেছি। এই চটা দিয়ে তৈরী ছিলাকে বলে 'পানিছা'। এ থেকে সাদৃশ্যে অর্থ হ'ল ভঙ্গুর। সত্যকার 'ছিলা' ও সাঁওতালি শব্দ, অর্থ চুলের তৈরি ধনুর্গুণ।

গ্রামে প্রচলিত অজস্র শব্দ বাদ দিয়ে শিষ্ট চলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন আরও কিছু সাঁওতালি শব্দের নমুনা এই পর্যায়ে আমরা দিচ্ছি। সাঁওতালিতে আ + উল্টো উ যে যে উচ্চারণে আছে তা আমরা 'আ' রূপেই নির্দেশ করছি। প্রয়োজনে সাঁও" প্রচলিত অর্থ দেওয়া হচ্ছে। আচ্‌কা =হঠাৎ। কলকাতা –কেন্দ্রিক ভাষায় এটি আ + চমক এর যোগে দাঁড়িয়েছে 'আচমকা'য়। বাঙ্ আবাগী = সাঁও আবাগি। অর্থ—স্বাথ-পরা, রূঢ়ভাষিণী। আজাড়ি = পাত্র খালি করা। এ থেকেই 'উজাড়' শব্দ। আল-গোসি = ঘুণাভরে, নাছুঁয়ে। বাঙ্ আল্‌গোছে। আনৌড়ি = আনাড়ি। আনুটাও

=যথেষ্ট হওয়া। বাঙ্ আঁটানো। আলা আলি, আলা মারা=ক্লান্ত বিপর্যস্ত হওয়া। আলা, এলিয়ে পড়া অবশ্য সংস্কৃত 'আকুল' থেকে সাঁওতালিতে তথা বাঙলায় গৃহীত হতে পারে। আল্গা=সহজ, শিথিল। সংস্কৃত=লঘুক=হলক থেকে পাওয়া এমন মনে হয় না। চর্যাগীতিতে পাই 'আলে গুরু বোবহি সীস'। 'আলে' শব্দের সাঁওতালিতে অর্থ ভৎ'সনাকারী। গুরু ভৎ'সনা করে, আর শিষ্য বোবা থাকে, চরণটির এই অর্থই সঠিক। আড়ে=আলি=মাঠের আ'ল। ওং=সাঁও অং =সুযোগ। আঁট=শক্ত, জোরদার। এ থেকে বাঙ্ আঁটা, আঠা=জোড়া লাগানোর জিনিস। আটি=বাঙ্ আঁটি (গুচ্ছ)। কল=যান্ত্রিক কৌশল। কল=গজিয়ে ওঠা অঙ্কুর, সং 'কলা' থেকে আসতেও পারে। কাকা=খুল্লতাত। চাচা=খুল্লতাত, যদিও শব্দটি এসেছে চো চো করে কাকাদের শিশুকে হাঁটা অভ্যাস করানো থেকে। কাচা=খাটো ধুতি, 'পরি দুপেণের কাচা ভানিত আমার ভাচা'। কাঁচা=অপক্ক। কাড়াকাড়ি=কলহ, মন কষাকষি। কাহার=তুলি—পাল্কির বাহক। কোঁকড়া। কালা=কানে শোনায় অশক্ত। কলি=একটি কবিতা বা গান। বাঙলায় দাঁড়িয়েছে গানের চরণ। ছড়া=কবিতা। কাঁকর=কাঁকর। কৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় 'খাঁখার'। সাঁও কংখার=বন্ধ্যাদোষ, বিনাশ। কাঞ্জি=আমানি। কয়লা=বড় জাতের উচ্ছে। বাঙ 'করব' খন, যার 'খন' এর খন 'ক্ষণ' শব্দ আসেনি মনে হয়। সাঁও খন=থেকে, এর পর। খোঁড়া=খঞ্জ। খুব=অত্যন্ত। খুচরা=ভেঙে ছোট করা। খুলা, খোলা= অনাবৃত করা। কয়লা। চিড়িয়া। কাটাও=সময় অতিবাহিত করা। সাঁও 'পোহাও' শব্দেরও অর্থ তাই। 'আগুন পোহায়' এর মূল অর্থ আগুন নিয়ে সময় কাটায়, খাঁচা। খাঁক=লোভী। খাল=গভীর জল সঞ্চয়, জলের খাত। চামড়া ছাড়ানো খালি। খালুই=মাছের চুবড়ি। খামচা=হাত দিয়ে নখ দিয়ে ধরা। খুঁটি= চর্যাগীতির 'খুশি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী'। 'কাছি'ও সাঁওতালী। খাতা=দল। 'আয়রে আয় ছেলের খাতা, মাছ ধরনে যাব'। শব্দটি 'কাতা' নয়। খাটো=ছোট। দুইই সাঁওতালি। খিল। খিড়কি=জানালা। খোঁপা। খোঁচা। কন্তা=লাল সুতো। কুলানো=সাঁও কুলো=(যথেষ্ট হওয়া)। কুলু, কলু=তৈল প্রস্তুত কারক। দাদা=বড় ভাই। ডাক=আহ্বান। ডাহুক। ডানা=পক্ষ। দানা= শস্যের খাদ্যাংশ। ধান্দা=উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। 'ডাং' যা থেকে ডাণ্ডা=মোটা লাঠি। ডাঙ্গা, ডাঙা=চাষের অযোগ্য উচ্চভূমি। কাড়া=পুং মহিষ। জাঁক=দম্ভ, কড়া প্রশাসন চালানো। জিরাও=জিরানো, বিশ্রাম নেওয়া। চেঙড়া=দশ-বারো বছরের বালক। ছোণ্ডা-ছুণ্ডি, ছোঁড়া-ছুঁড়ি=বালক-বালিকা। দৌড়=ধাবন। ছুটি=অবকাশ, বিরাম। চাঁএ, চাঁই=ঝগড়াটে, শ্রেণীবিশেষের লোক। চাহাও= ইচ্ছা করা। চাহাঃপ্=মুখ খোলা, সাদৃশ্যে চোখ উন্মীলিত করা। 'চাহা চাহা আল বড়য়ি কদম্বের তলে'। চাহে=হিন্দী 'বোধ হয়'। চাহি=প্রয়োজনীয়, যার অভাব তুঁ চাহিদা। চাকু=হাতল দেওয়া ছুরি। চাকি, চাকতি চাল=ঘরের চালা। 'চাল-চলন' বাঙ্ থেকে সাঁও-তে সংগ্রহ করা। চালা=চালুনি দিয়ে খোসা ধুলো প্রভৃতি পরিষ্কার করা। কিন্তু 'চাল মারা' সাঁওতালি। চাল-চুলা=চালা-

চুলা = যা থাকে তা ভাগাভাগি করে সঞ্চয় করা। চাওলে = চাউল। চাপাও = একটার উপর অন্যটা রাখা। চাপেচুপে = বাঙ্‌ চুপেচাপে, চুপচাপ। চটক, চট্‌পট্‌ = দ্রুততা সহকারে। চারা = অল্প পূর্বে উদ্‌গত ছোট গাছ। ছবি। ছাপ, ছোপ = যা থেকে ছোব = ছোঁ এসেছে। ছাল। ছটাক। ছাপা। ছাতি। ছটপট = ছটফট। ছিনার = নির্লজ্জা, বেশ্যা। এটি সং ছিন্ন + নালিকা থেকে সাঁও-তে এসেছিল মনে হয়। ছিটকাও = ছিটানো। ছুটাউ = পালানো, ফসকে যাওয়া, ছেড়ে যাওয়া। ছুটকী = দ্বিতীয়া পত্নী, বাঙলায় পরিবারের ছোটো বউ। ছাড়াছাড়ি = ডাইভোর্স। ছি = লজ্জা-ঘৃণা। চড়া, চড়হাও = আরও বেশি, বাড়ানো। চরখা। চরখি = তুলো থেকে বীজ ছাড়ানো। চিলম = হুঁকোর কল্কে। চোপসো = স্বাদহীন। ছড়া = কবিতা। ডাঙুয়া = ডেঙো = অবিবাহিত। তু° ডেঙ্গু জ্বর। চুড়া, চুড় = সূক্ষ্মাগ্র শীর্ষ। চুক = ভুল। চুকো = নিষ্পত্তি করা, সমাপ্ত করা। চুলহা = উনান। চুড়িন = গর্ভবতী মেয়েভূত। তু° শাঁখ চুরনি। চুড়ি। ডেরা = বাসগৃহ। ধাকা = ধাক্কা। ধমকাও = ভর্ৎসনা করা। ঢেঁকি = ঢেঁকি। ডুবো = প্লাবিত করা, ডোবানো। দাদা = বড় ভাই। ধামধুম = ধুমধাম। ঢেমালি = অলস, অসতর্ক। তু° ধামালি। ঢিল = শিথিল, অসতর্ক। ঢিলো = ঢিল দেওয়া। ঢিমা = মৃদু। ঢব = প্যাটার্ন। তু° ঢপ কীর্তন। ধোঁকা, ধোকা = সন্দেহ, বঞ্চনা। লাগিত্‌ = বাঙ্‌ 'লাগি'। লাড়ু। লেম্বু, লেবু। নালা = নালা। লাগ = বিরোধিতা, কলহ। লণ্ডভণ্ড = অপবিত্র করা। ভণ্ড = অবৈধ প্রণয়ী। লংকা = অতি দূরবর্তী। তু° চর্যাগীতি—'নিয়ড়ি বোহি মাজাহু রে লাংক' এই লংকা বিশিষ্ট দেশবাচক নয়। লাউটাউ = হিন্দী 'লোটনা'। লেংগা = বাম। লেংচা = খোঁড়া। লেটাও = মাটিতে গড়ানো—হিন্দী। নিট = স্থির, এক পয়সাও কম নয়। লোকসান = বিনষ্ট। লোটা = পিতলের ঘটি। পঁয়তারা = শুভারম্ভ। পাগল। পগার = সংকীর্ণ জলপ্রবাহ। পহিল = প্রথম। প্রথম + ইল্ল? পালট = বস্ত্রবদল। পালো = শুষ্ক, খাওয়ার অযোগ্য। পাতা = পর্ববিশেষ। ফুল-পাতানো, সই পাতানো। ফাঁকি = গুঁড়ো ওষুধ। পারানিক = পঞ্চপ্রধানের একজন। তা থেকে বাঙ্‌ পরামানিক। ফাউ = বাড়তি, বেশির ভাগ উল্টা, উল্টা-পাল্টা বাঙলার সমার্থক।

বহু বাক্যে ব্যবহৃত আমাদের বাঙলা 'ত' 'তো' অব্যয়ের মূল যে সাঁওতালি মৃদু নিশ্চয় বা অনুনয় বোধক 'দ' এরই প্রতিরূপ এতে আমরা নিঃসংশয়। সাঁওতালিতে প্রতিবাক্যে একটা ক'রে 'দ' ব্যবহৃত হয়। বাঙলা আমি ত, সে ত (কলকাতা-কেন্দ্রিক উচ্চারণ 'তো')। তেমনি, গ, গে। বাঙলায় এটি গ, 'গো' হয়েছে। মধ্য-বাঙলায় এবং কবিতায় এর প্রয়োগ ব্যাপক। বাঙলা সংযোজক অব্যয় 'ও' এসেছে ফারসী 'ব' থেকে। কিন্তু আমিও, সেও এই ও (মধ্য বাঙলা আমিহ, সেহো)? সাঁও অনুরূপ অর্থবোধক ই এর মূল নিঃসন্দেহে। এ ছাড়া চকচক, ঝকঝক, টনটন, কটকট, ডগমগ প্রভৃতি অজস্র অনুকার শব্দও আমরা সাঁওতালি থেকেই পেয়েছি।

[ক্রমশঃ]

বাঙলা ভাষায় সাঁওতালী উপাদান

'সাঁওতাল' শব্দটির মূল সংস্কৃত, আমাদেরই দেওয়া নাম 'সামন্তপাল'। ওটি সাঁওতালী ভাষার শব্দ নয়, এমন কোনও মূল নৃগোষ্ঠীরও পরিচায়ক নয়। কোলবংশজাত খেরোয়াল সম্প্রদায়ের যাঁরা তীর ধনুক নিয়ে সামন্ত রাজন্যের সেনার কাজ করতেন, তাঁদের সামন্তপাল নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ক্রমে সামন্তপাল এই শ্রেণীর আদিবাসীদের সাধারণ আখ্যা হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অবশ্য আমরা সাঁওতাল শব্দের প্রয়োগ বিশেষ পাই না, পাই কোল শব্দের। সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যে এদেরই নিষাদ বলা হয়েছে। বস্তুত কোলই হচ্ছে সাঁওতাল, খেড়িয়া, ভূমিজ (কৃষিজীবী), শবর (লোধ) প্রভৃতি বৃত্তিজীবী শাখা সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও বিশেষ আখ্যা।

আর, আজকের যারা বৃত্তি-অনুসারে বর্ণহিন্দুদের কাছাকাছি এসে বসবাস করছে এবং বর্তমানে যারা অন্ত্যজ আখ্যায় তফসিলী সম্প্রদায়ের তালিকাভুক্ত এমন, বাগদি, মেটে, ডোম, বেদে, বাউরি, কাহার, খয়রা প্রভৃতিও প্রাচীন কোলদেরই প্রত্যক্ষ বংশধর। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের অধ্যয়নে বিশেষভাবে বাঙলা, বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামের বর্ণহিন্দুরাও প্রায় সর্বাংশে নিষাদদেরই প্রজাতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আড়াই হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম বিমিশ্র আর্যদের ভাষা ও রাষ্ট্রিক আধিপত্য বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃতকে ধীরে ধীরে নিজ ভাষা করে নিলেও, পুরুষানুক্রমে এবং তার পরও কোলগোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শ থাকার জন্য আমরা তাদের বহু শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গি গ্রহণ করে এসেছি।

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর নিপুণ ভাষাতাত্ত্বিক বুদ্ধিতে বাঙলা এবং সেই সঙ্গে উত্তর ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির ধারাবাহিক সংস্কৃত প্রাকৃত মূল নির্ণয় করে গেছেন। বহু বাঙলা শব্দের অনার্য মূলও লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু যে কালে তিনি ভাষাচর্চা আরম্ভ ও সমাপ্ত করেন তখন সাঁওতালীর কোন অভিধান প্রকাশিত হয়নি। মিশনারি ক্যামবেল সাহেব সাঁওতালী অভিধান প্রকাশ করেন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এবং তারপর থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মন সাঁওতালীর দিকে আকৃষ্ট হলেও ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এ নিয়ে কোন চর্চাই হয়নি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোনও সাঁওতালী অভিধান প্রকাশিত হলে সুনীতিকুমার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতেন যে, যে-

শব্দগুলিকে প্রাকৃত-সংস্কৃত মূলে টেনে নেওয়া যাচ্ছে না এবং 'দেশী' নাম দেওয়া হচ্ছে অথবা খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষার মধ্যে আনুমানিকভাবে ফেলা হচ্ছে, সেগুলিও কোল বা সাঁওতালী ভাষারই শব্দ।

এইভাবে অভিধানকারেরাও সাঁওতালী না জানা থাকায় কষ্ট শব্দ থেকে খাটো, ফারসী গজব (=অভিশাপ) থেকে গুজব, গোত্র থেকে গোটা, নাই নাড়িজ্ঞান যার=আনাড়ি, এরকম অপব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। প্রচলিত বড়ো বড়ো বাঙলা অভিধানগুলি এরকম বহু কল্পনাপূর্ণ ত্রুটি বহন করে চলেছে।

সাঁওতালীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখা যায় আজ পর্যন্ত সে ভাষা যেমন আর্য-ভাণ্ডার থেকে বহু শব্দের বা প্রত্যয়ের ঋণ নিয়েছে, তেমনি কালক্রমে বাঙলা-হিন্দির মধ্যস্থতায় ফারসী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি শব্দের ঋণও নিয়েছে। সংস্কৃতও নিয়েছে অজস্র ঋণ দ্রাবিড় ও কোলগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু আবার এমনতর বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে সংস্কৃত থেকে কোল ভাষা ঋণ নিয়েছে, না, কোল ভাষার শব্দ অনুস্বার-বিসর্গ যোগে বেমালুম সংস্কৃত হয়ে পড়েছে, আজ আর তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। যেমন সাঁওতালী, মাএঞ্জউ= নারী। এ শব্দমূলে সংস্কৃতের 'মাতৃজীব' কারণ, মাতৃবাচক তিনটি শব্দ সাঁওতালীতে রয়েছে। এঙ্গা, আইয় এবং গ এর মধ্যে আয়্য=আর্য। 'মাতৃ' কেবল ভারতের নয়, ইউরোপীয় ভাষারও শব্দ। কিন্তু সাঁওতালী মঞ্জ=সুন্দর ও সংস্কৃতের মঞ্জু শব্দকে কার কাছ থেকে নিয়েছিল আজ বলা মুশকিল। তেমনি সাঁওতালী গাতে=কন্দু এবং সংস্কৃত জাতি একই শব্দ, সংস্কৃত হরিৎ=সবুজ এবং সাঁওতালী হরিয়াল একই অর্থের একই শব্দ, আর=অন্য, সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে হবে, পরিমাণবাচক আর (আরও)সাঁওতালী 'আরহ'=শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আহু, মূল সংস্কৃত হতে পারে—কিন্তু 'এবং' অর্থে 'আর' নিঃসন্দেহে সাঁওতালী। বাঙলা 'আছ' ধাতু ও পালির 'অচ্ছতি' ক্রিয়ার মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, আন্দাজ করা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল। সাঁওতালীতে হওয়া থাকা ক্রিয়ার বাচক শব্দ হল কানা, মেনা। "মেনা"-র বিকল্পে মেনাছ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, "মেনা" ক্রিয়া তত বলবান না হওয়ায় 'আছ' ক্রিয়ার যোগে বলশালী করা হয়েছে। সাঁওতালী অতীত বাচক 'কেঃৎ' কি সংস্কৃত 'কৃত' শব্দের বিচ্ছিন্ন রূপ? অথবা 'তেৎ' নেওয়া হয়েছে 'ত্' থেকে? এসব ঠিকমতো নির্ধারণ করার জন্য দুই ভাষা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

সাঁওতালী মোটামুটি শব্দে-শব্দে জোড়া বা সন্ধিলাগার ভাষা। সংস্কৃত এবং তজ্জাত বাঙলা-হিন্দি প্রভৃতির মতো বিভক্তি-প্রত্যয় যোগে পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহারের ভাষা নয়। তবু সাঁওতালীতে বিভক্তি-নির্দেশক এবং প্রত্যয়-বাচক বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে হিন্দি-বাঙলা-ওড়িয়ার যোগ ঘনিষ্ঠ।

যেখানে সংস্কৃত মূলে নির্দেশ করা যাবে না, বাঙলা হিন্দি ওড়িয়ায় এমন নোতুন প্রত্যয়, অনুসর্গ ও অব্যয় কোল গোষ্ঠীর ভাষা বা সংক্ষেপে সাঁওতালী থেকেই সমাহরণ করা, যেমন—

(১) সাঁওতালী 'দ' এবং 'গে' বা 'গি' বাক্যের মধ্যে প্রায় বিনা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এগুলি বাগ্‌ভঙ্গিমার সৃষ্টি করে মাত্র। তেমনি অনুজ্ঞা-বোধক বাক্যকে আরও নম্র করার জন্য ব্যবহার করা হয় 'মা' বা 'দো'। অনুজ্ঞার সঙ্গে অনুনয় দ্যোতনা করতে পারে এমন সংক্ষিপ্ত অব্যয় বাঙলায় নেই তবে 'তো' শব্দ আছে যাতে অস্বীকার এবং অনুজ্ঞাকে খানিকটা নম্র করে দেওয়া হয়। আমাদের আন্দাজ বাঙলার ঐ ত, তো, 'সাঁওতালী 'দ' 'দো' এরই সংস্রব —জাত।

আমরা মনে করি, সাঁওতালী 'দো', বাঙলা ও হিন্দিতে রূঢ়তা নিরোধক 'তো' রূপে নিয়েছে। যেমন—'আমি তো জানি না। 'সে তো খুব বড়ো লোক', 'করুন তো' 'চলিয়ে তো' 'দেখো তো' ইত্যাদি। সাঁওতালী 'গি', বৈদিক নিমিত্তার্থক ও সংস্কৃতের আধা নিশ্চয়ার্থক 'হি' এবং বাঙলা নিশ্চয়ার্থক 'ই' যেমন আমিই করেছি, সবই তো জানা যাবে, করবোই করবো—এর মধ্যে কোনো যোগ নিশ্চয়ই আছে। সংস্কৃত 'হি' পাদপূরণেও প্রযুক্ত হয়।

(২) উক্ত পরিস্ফুট অর্থহীন 'গে' এবং মাত্বাচক 'গ', 'গো' বাঙলায় বহুল প্রচলিত এবং বিমিশ্রিতও বটে। মধ্যযুগের বাঙলায় 'গো'-এর পরিবর্তে কবিতায় 'গ'—এরই প্রয়োগ বেশি দেখতে পাই। আবার পূর্ববঙ্গীয় চলিতে— বাকি পয়সা কি তুমি ফিরিয়ে দেবে? এর উত্তরে আধুনিক ও মধ্য বাঙলায় 'না-গ'—সর্বত্র 'না-গো'। 'গো' শব্দ কবিতায় বিশেষত পদাবলীতে অজস্র। সাঁওতালীতে হাঁ বাচক শব্দ হেঁ। বাঙলা বা প্রাকৃতে হবে হুঁ। সংস্কৃতে আং-এর সঙ্গে কোনো দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ আছে কিনা ভাবতে হবে। কিন্তু বাঙলা 'হেই মা', 'হেই বাবু', ইত্যাদির 'হেই' যে হেঁ শব্দ থেকেই এসেছে তা বোধ হয় বলা যায়।

(৩) সংস্কৃতের কারক-বিভক্তির চিহ্নগুলি সব আধুনিক ভাষাতেই বিশেষভাবে লোপ পেয়ে গেছে। কাজ চলছে বিভক্তিবাচক শব্দ বা অনুসর্গ যোগ করে। সাঁওতালীতেও বিভক্তি চিহ্নের বালাই নেই। শব্দ, শব্দাংশ বা অনুসর্গই কারক সম্বন্ধ প্রতীত করায়। বাঙলা, ওড়িয়া এবং হিন্দীতেও কারক-বিভক্তি নির্দেশ করতে অনুসর্গের কিছু সংস্কৃত থেকে ধারাবাহিক কোনো রীতিতে হয়তো এসেছে, কোনোটি কোল গোষ্ঠী থেকে, কোনোটি বা দুয়ের মিশ্রণে। সম্বন্ধ পদের 'র', 'এর' বিভক্তি আচার্য সুনীতি কুমারের মতে সংস্কৃত কার্য এবং প্রাকৃত 'কের' 'কর' থেকে এসেছে। কিন্তু বাঙলায় সম্বন্ধ পদের একটা বৈশিষ্ট্য হ'লো এর অনেকগুলি কেবল সম্বন্ধ ছাড়া

বিশেষণ-বোধকও, যেমন—তোমার বই, ঘরের কাজ, সোনার ঘড়ি, পাঁচের কোঠা প্রভৃতি। সম্বন্ধের এই বিশেষণ বোধকতা সাঁওতালীর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। সাঁওতালীর সম্বন্ধবাচক শব্দ হলো—'রেন', 'রে', 'আক'। অধিকরণে 'রে' এবং করণে 'তে' শব্দও সাঁওতালীর। ওড়িয়া অধিকরণের প্রচলিত বিভক্তি হ'ল—'রে', যেমন 'ঘররে' 'পুরীরে' 'দিনরে'। হিন্দী দ্বারা বা হইতে অর্থে প্রযুক্ত 'সে' যেমন—'তুমসে নঁহী হোগা', 'ঘরসে বহার হো গয়া'—নিশ্চিতভাবে সাঁওতালী 'সে, সেচ্' থেকে নেওয়া হয়েছে। বাঙলায় পূর্বে একটি প্রচলিত অনুসর্গ ছিল—ঠাঁই, ঠেঁয়ে। সাঁওতালীতে এটি হল 'ঠেন', 'ঠেঃ' অর্থ নিকটে, দিকে। বাঙলায় তাহার ঠাঁই, তার ঠেঁয়ে চেয়ে নিলাম ইত্যাদি। সুনীতিকুমারের মতে এটি সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ থেকে এসেছে। তা হলেও সংস্কৃত ও সাঁওতালীর আদান-প্রদান লক্ষণীয়। বাঙলা—লাগি, লেগে সুনিশ্চিতভাবে সাঁওতালী 'লাগিত' শব্দ থেকে এসেছে। একই অর্থে 'কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী'—সাঁওতালীতে হবে কালা লাগিত ইঞ্ নেলা হোএ কানাঞ। সাঁওতালীতে, বয়াতে, হোতেতে বাঙলা-'তে' শব্দে প্রভাব বিস্তার করেছে কি না বিচার করে দেখতে হবে। 'হইতে' তো নিশ্চিতভাবে সাঁওতালী 'হন্তে' জাত। অবশ্য এই 'হই' এবং 'হোত্র' ক্রিয়ার 'হ' মূলে সংস্কৃত কি না বিচার করতে হবে। একটি অনুসর্গ এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কিন্তু শিষ্ট কোলকাতায় তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যেমন বেগর—ছেলেটা জল 'বেগরে' মারা গেল। সংস্কৃত 'পশ্চ' এবং সাঁওতালী 'পচ্ছ' একই অর্থের। সুতরাং একই মূল থেকে এসেছে কি না দেখতে হবে। এ থেকে বাঙলা অনুসর্গ হ'ল—পাছে। চেয়ে=চাহ ধাতুর মূল সংস্কৃত নয়। হিন্দীতে অবশ্য অন্য অর্থে 'চাহে' (perhaps); এ দুয়েরই মূল সাঁওতালী আর চাহাঃপ্ শব্দের অর্থ হইতে, চেয়ে।

বাঙলা কেমন, যেমন—শব্দের কিম্ সংস্কৃত। কিন্তু মন্ অংশের ঐ অর্থে সংস্কৃত মূলে দুর্লভ। মধ্য বাঙলায় ঐ শব্দটি কিমত কেমত জেমত ইত্যাদি ছিল, ঐ 'মত' শব্দ নিঃসন্দেহে সাঁওতালী 'মেন্তে' শব্দ জাত, মেন্তে অর্থ নিমিত্ত, কিরূপ। সাঁওতালীতে ব্যবহৃত 'জেমন' শব্দ পরে বাঙলা থেকেই ঋণ-নেওয়া।

বাঙলা এবং-বাচক 'ও' আর আমিও সেও ইত্যাদির 'ও' একার্থক নয়। মধ্য বাঙলায় পাচ্ছি আমিহ, সেহ, সেহো। এই 'ও' এর অর্থ also-এর বাচক সাঁও শব্দ হ'ল হঁ। সুতরাং এই ও-টি হঁ থেকেই এসেছে। 'আর'=অন্য একটি বার এবং আর পারিনা, আর কখনও করবো না, আরও চাই, আরও দাও এইসব পরিমাণ বাচক শব্দ তদ্ভব। তা ছাড়া না এবং বাচক দ্বিতীয়টি সাঁওতালী আর, আরহঁ থেকেই এসেছে মনে করা যায়। সাঁওতালী 'খন'

শব্দের বাচ্য হ'ল-হইতে। বাঙলায় যাব'খন, করব'খন প্রয়োগে ঐ 'খন' শব্দের প্রভাব অনুমেয়।

(৪) সাঁওতালী বাক্যভঙ্গীর সঙ্গে বাঙলা বাক্যভঙ্গীর কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই পাওয়া গেছে। সেটি হ'ল প্রথমে কর্তা শেষে ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়ার মধ্যে যদিও বিশেষণ অব্যয় কর্তার রূপ প্রভৃতি একত্র যুক্ত হয়, কিন্তু মোটামুটি কর্তা ও ক্রিয়ার মাঝখানে কর্ম, অধিকরণ সম্বন্ধ প্রভৃতি ব্যাপার সাঁওতালীতে বাঙলার মতোই দেখা যায়। শব্দ-সন্ধির বা স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে বাঙলার মতো য়-শ্রুতি প্রয়োগও সাঁওতালীতে লক্ষণীয়।

সাঁওতালীতে শব্দে শব্দে জোড়া লেগে উচ্চারণে এক শব্দ হয়ে গেলেও পৃথক শ্বাসাঘাতের জন্য সেগুলি মিলে গিয়ে হ-য-ব-র-ল হয়ে দাঁড়ায় না। এই শ্বাসাঘাত বাঙলা উচ্চারণেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত থেকে বাঙলা ছন্দের উদ্ভব অল্পবিস্তর এই শ্বাসাঘাতই নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সাঁওতালীর সঙ্গে বাঙলা বাক্‌রীতির আর একটি সাদৃশ্য স্বরের উত্থান-পতনে। সাঁওতালীতে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যে 'কি' শব্দ থাকে না, বাক্যে শেষের দিকে স্বরের উচ্চতা থাকে, আর তাতেই প্রশ্ন বোঝা যায়। বাঙলায় 'কি' শব্দ থাকুক না-ই থাকুক, প্রশ্ন-বাক্যে স্বরের উত্থান শেষের দিকে। তুলনায় ইংরেজিতে গোড়ার দিকে এবং ক্রিয়া বা সহায়ককে আগে স্থান দিচ্ছে।

বাঙলা বাক্যারম্ভে স্থানবিশেষে ক্রিয়া বা কর্তার প্রসারক কর্তার আগেই বসে। সাঁওতালীতেও তাই।

সাঁওতালীতে বিশিষ্ট ক্রিয়াবাচক শব্দ যদিও কিছু আছে, কিন্তু 'আ' যোগে যে-কোনো শব্দকেই ক্রিয়ায় পরিণত করা যায়। বাঙলা ঐ আ-যোগটি সাঁওতালী থেকে গ্রহণ করেছে। যদিও কিছু নামধাতু ছাড়া যে-কোনো শব্দই সংস্কৃত বা বাঙলায় ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করতে পারে না। আমরা মনে করি মূল ধাতু কর্, চল্, পড়্, শুন্ থেকে ক্রিয়ামূলে পড়া, চলা, করা, দেখা, শোনা প্রভৃতির আ-যোগ সাঁওতালী প্রভাবজাত।

বাঙলায় সংস্কৃত-প্রাকৃতের অনুসরণে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবধান রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে হরওনি। বিশেষণ প্রয়োগে তো স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহার না করাই বাঙলায় নিয়ম। সাঁওতালীতে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের আকারে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও বাঙলা ও হিন্দীর অনুসরণে কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে এই পার্থক্য করা হয়েছে, যেমন—কাড়া (বালক)—কুড়ি (বালিকা), বুড়া-বুড়ি, ছোণ্ডা-ছুণ্ডি। বাঙলায় সুন্দর বা ভালো ছেলে বা মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে। চিকন গোয়ালিনী, তরঙ্গিত নদী প্রভৃতি চলতি বাঙলার লিঙ্গনিরূপণ বর্তমানে ইংরেজির সাদৃশ্যে। সাঁওতালী বাঙলা শব্দ-ঋণ বিষয়ে পৃথক্ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাঙলা শব্দদ্বৈত এবং অনুকার শব্দের প্রায় সবই সাঁওতালীতে পাওয়া যায়। বাঙলায় অন্য সাঁওতালী শব্দের ঋণও প্রচুর। মৌখিক ও উপভাষার বাঙলাতে তো বটেই, সাধু ও শিষ্ট চলিতের বাঙলাতেও আমরা হাজার হাজার সাঁওতালী শব্দ ব্যবহার করে চলেছি। অবশ্য সাঁওতালী ভাষাও কালে কালে সংস্কৃত থেকে এবং ফারসী-পোর্তুগীজ ইংরেজি থেকেও শব্দের ঋণ গ্রহণ করেছে। ঐ সব বর্জন ক'রে আপাতত কয়েকটি শব্দ মাত্র এখানে আলোচনা ক'রে দেখানো হ'ল—

১। আচকা—পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক বাঙলায় এর প্রয়োগ আজও চলেছে। কেবল কোলকাতা অঞ্চলে মাঝে একটা 'ম' যোগ করায় দাঁড়িয়েছে 'আচমকা'—'চমক' সাঁও শব্দের প্রভাবে।

২। আড়শুলো=আরশোলা। আড়=দেওয়াল+সং শলভ থেকে শুল্য যোগে উৎপন্ন।

৩। আড়ং (আড়ং ধোলাই, আড়ংঘাটা)-মূল সাঁও। শব্দ আড়ন, অর্থ তসর গুটি বা সুতা প্রস্তুত করা। অন্ বোধ হয় বাঙলা ভাববাচক প্রত্যয় যোগ।

৪। বাঙলা—উহা, উ। 'ও' ব্যক্তি ও বস্তুবাচক নির্দেশক সর্বনাম। সংস্কৃতে মূল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অদস্ বা এতদ্ শব্দ থেকে আসতে পারে কি? সুনীতিকুমার 'আসৌ' 'অমু' এ রকম শব্দমূল কল্পনা করেছেন। শব্দটি সম্ভবত সাঁও 'ওনা' থেকে এসেছে।

৫। আনোখা=অকারণ। বাঙলায় দাঁড়িয়েছে খানখা, কোলকাতা অঞ্চলে বিকৃত হয়ে খামখা। যেমন 'খাঁকিতি' বিকৃত হয়ে এখনকার কারো কারো অশুদ্ধ প্রয়োগে দেখছি 'খামতি'।

৬। 'আনাড়ি' মূল অর্থ নূতন, অজানা। এটিকে 'নাড়ীর' সঙ্গে ভুল ক'রে মিশিয়ে ব্যাসবাক্য করা হচ্ছে এবং ছেলেদের প্রশ্নপত্রেও দেওয়া হচ্ছে—নাই নাড়ী যার!

৭। অপেনি=আপনি। মধ্যম পুরুষের সম্মান বাচক শব্দ। এটি সাঁওতালী আপে=মধ্যম পুং বহুবচন শব্দ এবং সম্ভবতঃ 'হনি',=ঐ ব্যক্তি, এ দুয়ের যোগে নিষ্পন্ন। যে 'আপনি' শব্দের অর্থ নিজে, স্বয়ং—সে আপনি সং 'আত্ম' শব্দ থেকে, কিন্তু এই 'আপনি' তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থের। তুলনীয় হিন্দী 'আপ্'।

৮। এড়ানো=পাশে স'রে যাওয়া, avoid করা।

৯। এঁড়ে তর্ক এর 'এঁড়ে' শব্দ সাঁওতালী, অর্থ বঞ্চনা করা, ছল করা, মিথ্যা ছুতা ধরা।

১০। আড়ড়া=আড় (ব্যবধান অর্থাৎ প্রাচীর বা উঁচু ভূমি)+অড়া

=গৃহ। প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ। কবিকঙ্কণের কাব্যরচনায় দুর্গ প্রাচীর যুক্ত রাজবাড়ীর অনুসারে গ্রামের নাম।

পরিশেষে, শব্দের মূল ধরতে ভুল হতে পারে এবং অভিধানগুলিতে তা হয়েছেও এমন অ-কার থেকে ছ-কার পর্যন্ত আরও কয়েকটি শব্দের তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে—

১১। চড়ক=চড়হাও+অক। মূল অর্থ দেবতার কাছে উৎসর্গ। আল্‌গা, আঁটা, কলি (গান-কবিতায়)। কাকা-কাকি, মামা-মামি, চাচা (চাচো—শব্দ সহযোগে বাচ্চাকে হাঁটতে শেখানো), চিড়িয়া, চুড়া, ছোপ—ছোব (ছোঁ-নাচ), আড়গড়া (আড়=দেওয়াল, গড়া=গোয়াল), কালা (ঠাণ্ডা), খুলা (খোলা)=সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া। বেটা-বেটি, ছোট, জঞ্জাল (=দুঃখ, দুর্ভাবনা), খুড়া, কাঁথ—কাঁথি=মাটির দেওয়াল। কুড়ানো (কোমর থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ নিচু করা), চিড় খাওয়া, ছোকরা (ছুক=সুন্দর+কোড়া—বালক), চেঙ্‌ড়া (=দশ বারো বছরের ছেলে), বঁড়শি, ছাঁচা, বেঁক-মল, বেরুন=বেরুনে=বেরুনিয়া, বাউল (উন্মাদ), =বেগার=forced labour) বইহার ('আরণ্যক' দ্রঃ, ভালো ধানজমি), ভেদ (=Interpretation, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' দ্রঃ), আল (=negative, চর্যাপদ দ্রঃ), চুকানো, আটঘাট, চাউল, আনোখা (=খামোখা), ছুটকি (মূলে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী), চুড়ন (=বাঙলা শাখচুন্নি=মৃতা গর্ভবতী নারীর প্রেত)। ছড়া (গানের ধ্রুব অংশ), ছড়ি, ছাড়া, ছটাক, ছাঁকা, ছানা (=সংস্কৃত শাব+সাঁও 'না' বাচ্চাদের আহ্বানে), হাল, ছুটি, সিঁধ (সিন্দ্), ছোবল (=ছাবলাও), ছিনে জোঁক (ছিয়াঃ+জোঁক), 'ছাই' মূল অর্থ মিথ্যা, ছাঁচ (সাঁচ), ছিলা (=ধনুকের, মূল অর্থ—চুল দিয়ে তৈরি দড়ি)। ছুতো, ছররা।...ছুট=হঠাৎ বের হওয়া+সং রব থেকে রা) ছড়ানো, গলি (মূল অর্থ ফাঁকে সুতা পার করা)। নাট=সঠিক, decisively ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাঁও-বাঙলা অভিধান বিষয়ক "প্রস্তাবনা"

নির্মীয়মান এই গ্রন্থে কেবল সেইসব সাঁওতালী শব্দ গৃহীত হয়েছে যেগুলির সঙ্গে বাঙলার ঐক্য আছে। সেগুলি, হয় সাঁওতালী (অর্থাৎ কোল-মুণ্ডা) ভাষা থেকে বাঙলায় গৃহীত হয়েছে, নয়, বাঙলা, এমনকি পূর্বী হিন্দী, ভোজপুরিয়া, মৈথিলী থেকেও সাঁওতালীতে কিছু কিছু গৃহীত হয়েছে। লিখনে ও মুদ্রণে সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে বাঙলা ছাড়া ঐসব ভাষাকে কেবল হিন্দী (হি) আখ্যাতেই অভিহিত করতে হয়েছে।

যাঁদের আমরা সাঁওতাল ব'লে অভিহিত করছি তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যা হ'ল খেরওয়ার বা খেরওয়াল। খেরোয়াল হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমগ্র উত্তর ভারতের বাসিন্দা কোল-মুণ্ডা বা নিষাদদের বৃহত্তম শাখাগোষ্ঠী যাঁরা পূর্ব ভারতে বিশেষভাবে প্রবল ছিলেন আর্য-ভাষীদের এদেশে অনুপ্রবেশের বহু আগে থেকেই। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এঁদেরই বহুদূরবর্তী অন্য আর এক শাখাগোষ্ঠীর মানুষ বিদ্যমান ছিলেন। আর্যভাষীদের আসার আগে দ্রাবিড়ভাষী নামে ভিন্ন আর এক নৃগোষ্ঠীর মানুষ মুখ্যভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান ছিলেন। এঁদের সঙ্গে সিরিয়া মেসোপটামিয়া সহ এশিয়া মাইনরের প্রাচীন মানুষের জীবিকা ও শিল্পপ্রণালীর সাদৃশ্যও পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য এই যে আর্যভাষীদের পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশের আগেকার সেই প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়ে এইসব বিভিন্ন অনার্য-গোত্রের মানুষগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশ ও আদানপ্রদান সম্বন্ধের অভাব ছিল না. কারণ, ভাষার মধ্যে আদান-প্রদানের চিহ্ন বর্তমান। এঁদের জীবনযাত্রায় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নভাষী ও ভিন্নতর জীবনাদর্শবাহী শ্বেতকায় ও মুখ্যভাবে পশুপালক আর্যভাষীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে। তুলনায় সংখ্যাল্প হলেও রথসহ অস্ত্রশস্ত্রে ও সংহতিতে বলবান্ আর্যভাষীরা ক্রমে দ্রাবিড় ভাষীদের পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বিতাড়িত করে দেয় ও তারা দক্ষিণবাসী অনার্যদের সঙ্গে একত্র বসবাস করতে থাকে। কোল-মুণ্ডা গোত্রের অনার্যদেরও বিতাড়িত ও বশীভূত করে আর্যভাষীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সিন্ধু উপত্যকা ছাড়িয়ে তখনকার সরস্বতী ও দৃষদ্বতী অতিক্রম ক'রে গাঙ্গেয় সমতলে আত্মবিস্তার করতে থাকে। বশীভূত অনার্যদের স্বেচ্ছায় অথবা ধরে বেঁধে নিয়ে এসে কৃষিকর্ম, গৃহনির্মাণ, গোপালন প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করে। এই সূত্রে যেমন আর্য অন্-আর্য রক্তের বিমিশ্রণ ঘটে তেমনি ভাষার আদান-প্রদানও প্রারব্ধ হয়। আর্যদের নিজ প্রয়োজনেই এদেশের বস্তু, খাদ্য, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতির নাম এমনকি অনার্য সংস্কৃতি বিষয়ক নানান্ আখ্যাও গ্রহণ করতে হয়। এসব খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার

বছর আগে থেকে ক্রমে ক্রমে সংঘটিত ঘটনা। অন্য-আর্যদের সঙ্গে বিমিশ্রণে শঙ্কিত হয়ে কবিতা-মন্ত্র-বাদী ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সংহতিমূলক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যজ্ঞকর্মের প্রবর্তন করে। যদিচ কালবশে শুদ্ধিরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ হাজার শতকে অর্যভাষীরা অর্থাৎ বিমিশ্রিত আর্যেরা যমুনা সরস্বতী অতিক্রম করে আন্দাজ বারাণসী পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ঐ সময় থেকে তাদের ভাষাটা মৌল আর্যগোত্রের হলেও তার বৈদিক অধ্যায় চলে গিয়ে লোকপ্রচলিত লৌকিক অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃতের একটা সহজ মেশামেশির অধ্যায় চলতে থাকে। ঐ সময়টায় অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ হাজার দেড় হাজার শতকে অঙ্গ-বঙ্গ ও তার দক্ষিণের সীমা পর্যন্ত অঞ্চলে কোল-মুণ্ডা ও তাদের ভিন্ন গোত্রের অন্য-আর্যদের প্রবল প্রভাবের কাল। ঋগ্বেদে সংগৃহীত কবিতাগুলির * শেষের দিকের এক অধ্যায়ে স্বজাতি প্রীতিবৎসল এক কবিকে জানাতে হয়েছে যে ঐ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে তিন শ্রেণীর প্রজা অর্থাৎ মানুষ 'অত্যায়'-যুক্ত অর্থাৎ ব্যাপক ও প্রবল ছিল। পরে খ্রীঃ পূঃ হাজার শতাব্দীতে এর ব্যাখ্যায় বোঝানো হয়েছে যে ঐ অত্যায়-প্রাপ্ত জাতিগুলি হ'ল অঙ্গ-বঙ্গ-মগধবাসী ও চের-পাণ্ড্যেরা। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পর ধর্মদীক্ষার সূত্রে তখনই বহু বিমিশ্রিত ঐ আর্যদের পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশ প্রারব্ধ হয়। ক্রমে ভূমিলোভীরাও অভিযান করতে থাকে এবং ঔপনিবেশিকভাবের সূত্রে ব্যাপকভাবে বিহার-বাঙলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়, আর অশোকের জয়ে উড়িষ্যা-কলিঙ্গেও।

ব্যাপক বিমিশ্রণের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত-প্রাকৃতে যেমন বহু অন্য-আর্য শব্দের প্রবেশ ঘটে, তেমনি নিষাদ ও কোল আখ্যায় সাহিত্যে উল্লিখিত অনার্যেরাও বহু আর্যশব্দ গ্রহণ করতে থাকেন। বলা যায়, পূর্বেকার কিছু বিমিশ্রিত আর্যদের সঙ্গে অন্য-আর্যদের আরও ব্যাপক বিমিশ্রণ চলতে থাকে। এইরূপে জটিলভাবে মিশে যাওয়া আর্য-অনার্য থেকে পূর্বাঞ্চলীয়দের তথা বাঙালীদের জন্ম-উদ্ভব ঘটে। দেখতে গেলে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত এখন এ অঞ্চলে কোথাও এক ফোঁটা নেই বললেই চলে এমনতর নামসর্বস্ব আর্যদের সঙ্গে কোল-মুণ্ডাদের মিশ্রণেই আমাদের উদ্ভব। আর্যদের সেকালের পূর্বপুরুষদের ব্রাহ্মণ্য ও জৈনবৌদ্ধ আচার ও ধর্মীয় জীবনরীতি গ্রহণ করেই বাঁচতে হয়। তবু অনার্য ট্র্যাডিশানের বেশ কিছু উপাদান তার মধ্যে বজায় থেকে যায়। আমরা যারা আত্মবিস্মৃতের দ্বারা মিশে গিয়েছিলাম তারাই দেশের প্রধান ব্যক্তি

* বেদ রচিত হয় বন্দনামূলক কবিতারূপে, কিন্তু যজ্ঞবাদী ব্রাহ্মণেরা এগুলিকে 'মন্ত্র' আখ্যায় অভিহিত করেন ও অপৌরুষেয় ব'লে প্রচার করতে থাকেন।

হয়ে পড়ে। আর যেসব নিষাদ ঐভাবে আত্মদান করতে পারেনি তারা রাঢ়দেশ ও বিহার-ওড়িশার আরণ্য পার্বত্য অঞ্চলে সরে যায় ও কোনক্রমে জীবিকা-নির্বাহ করতে থাকে। পরে আবার জীবিকার তাগিদে ওদের অনেককেই আমাদের অধীনে কাজকর্ম নিতে বাধ্য হতে হয়। তারা হ'ল এখনকার হীনবর্ণ ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা। এরা মূল আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত ও বিচ্যুত হয়ে কোনওক্রমে হিন্দুদের সর্বনিম্ন গোষ্ঠীতে স্থান পায়। এখনকার ডম্ বা ডোম্, বাউরি বা বাইরি, হাড়ি, চুয়াড়, বাগ্দী, কাহার, কুড়মি প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে আসা অনুন্নত শ্রেণী, আধুনিক আখ্যায় তফশিলী। এই গেল ইতিবৃত্ত ও ভাষা-বিমিশ্রণের সংক্ষিপ্ত মূল কথা। হাণ্টারের প্রদত্ত ইতিবৃত্তে দেখা যায় দেড়শ'-দু'শ বছর আগেও হাড়ি, ডম্, বাউরি প্রভৃতি অন্ত্যজ ও সাঁওতালেরাই রাঢ়ের গ্রামগুলির মুখ্য অধিবাসী।

কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর খেরোয়ালদের সাঁওতাল নামকরণ সম্ভবতঃ বিমিশ্রিত আর্যভাষী অর্থাৎ আমাদেরই। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অনুমান 'সামন্তপাল' এই সংস্কৃত শব্দ থেকেই প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে 'সাঁওতাল' শব্দ এসেছে। ইতিহাস সম্মত সত্য এই যে এই নিষাদবর্গের মানুষ তিরধনু নিয়ে সামন্ত রাজা বা ভূম্যধিকারীদের রাজ্য রক্ষা করত, যুদ্ধ করত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও কোল বা নিষাদদের যোদ্ধারূপে বর্ণিত হয়েছে (কবিকঙ্কণ দ্রঃ)। বিহারীদের মৌখিক ভাষায় এদের লড়াকা বলা হ'ত। ক্রমে এদের গোত্রের সকলেই ঐ আখ্যায় বর্ণিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ জৈন ধারায় অনুপ্রবিষ্ট আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের বাদ দিলে (বলা বাহুল্য যে আদিকালের জৈন বৌদ্ধদের উপর ক্রমে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বের প্রভাব বেড়ে যায়) যারা বাঙলা বিহার ওড়িশার অরণ্যে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই খেরোয়ালদের তখনকার সংখ্যা কত হতে পারে তা বলা যায় না। তবে বর্তমানের লোকগণনা অনুসারে পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বিহার, বাঙলা, ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং আসামের খাসী পার্বত্য অঞ্চল মিলে এদের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের মত হবে। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল হ'ল সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জ। মালদহ সহ পশ্চিম বাঙলা তো বটেই, এমনকি উত্তর বাঙলার জেলাগুলিতেও এরা জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্যগোত্রের মিশ্র হিন্দুদের ভাষা থেকে এরা যেমন বহু শব্দ নিয়েছে (আনুমানিক পাঁচ সাত হাজার) তেমনি কালক্রমে আর্যগোত্রে দানও করেছে যথেষ্ট। উপভাষা সহ বাঙলায় ওদের কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ দশ বারো হাজার নিশ্চয়ই। তেমনি ওদের ভাষায় পূর্বী প্রাকৃতের ও বাঙলা হিন্দীর শব্দাবলী (আরবী ফারসী ইংরেজি পোর্তুগীজ সহ) গ্রহণের পরিমাণ আন্দাজ সাত আট হাজার হবেই। অধুনা সাঁওতালদের মধ্যে আমাদের মত শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় তথা যোগাযোগ বেড়ে ওঠায়, অর্থাৎ বাঙলা,

হিন্দী, বিহারী প্রভৃতি ভাষার ছোঁওয়া ও ঐসব ভাষার সাহিত্যিক কীর্তি-গুলির প্রভাব পড়ায় তাদের ভাষার মধ্যে আর্যগোত্রের ভাষার অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক সাঁওতালেরা তাদের স্বকীয় ছড়া গান রচনার ধারা প্রায় ভুলেই গেছে এবং পরিবর্তে আধুনিক গীতিকবিতা, নাটক, গল্প ('কাথা') প্রভৃতি রচনা করে চলেছে। বর্তমানের আমরা ওদের ভাষা ও জীবনধারা থেকে কিছু সংগ্রহ করছি না এবং সেই সঙ্গে ইয়োরোপীয় জীবন-ধারার ভক্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে হয় আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহীরা সাঁওতাল সম্পর্কের স্মৃতি ধরে যেমন কিছু লৌকিক দেবতা ও কৃষিসংলগ্ন পাল-পার্বণ, তেমনি সে সবের ছড়া ও ব্রতকথা আয়ত্তে রেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনে অন্তত নারীদের মধ্যে আজও সেগুলি জীবন্ত রয়েছে।* এখনও প্রচলিত ঝুমুর গানের বিষয় (রাধাকৃষ্ণ বাদ দিয়ে) ও রীতি পদ্ধতি ওদেরই কাছ থেকে পাওয়া। আমাদের শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দপদ্ধতি নিঃসন্দেহে ওদের, আর বাউল গানের সুর ও নৃত্যরীতি ঝুমুরের সঙ্গে সাঁওতাল সংস্কৃতি থেকেই হয়ত বা গৃহীত। আমাদের সমাজ সম্পর্ক, বিবাহে সিঁদুর দান ও অন্য বহু আচার অনুষ্ঠান পালন, পারিবারিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচারের মূলে সাঁওতালদের রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ আজও দেখা যায়। ভারতের চিরাচরিত গ্রাম-প্রধান ও পঞ্চায়েতি প্রশাসন ব্যবস্থাও কোল-গোষ্ঠীদের সমাজ-বিন্যাসেরই প্রতিরূপ। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে ওদের নৈসর্গিক জ্ঞান, গাছ-গাছড়া, লতাপাতা বন্যপ্রাণী ও মাছ প্রভৃতির নাম, কৃষিকর্ম ও মৎস্যশিকারের প্রণালী, নদী-পারাপার যাত্রীবহন রোগের ওষুধ, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি।

সাঁওতালী শব্দাবলী সংগ্রহের পর যেমন ঐসব সাংস্কৃতিক ঋণের পরিমাণ ধরা যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিকদের অব্যাখ্যাত বা আন্দাজে ব্যাখ্যাত বহু শব্দের কোষ্ঠী-ঠিকুজি। পশ্চিম বাঙলার গ্রামজীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সাঁওতালী থেকে ধার নেওয়া আরও বহু শব্দের পরিচয় পাবেন। কিন্তু কেবল শব্দই নয়, বাক্যবিন্যাসে, প্রত্যয়াদিতে ও বিভিন্ন কারকের সহায়ক পদের ব্যবহারেও বাঙলা হিন্দীর বেশ কিছু ঋণ রয়েছে ওদের কাছে। বাঙলা টা (একটা, দুটো), টে (পাঁশুটে, তামাটে, ঝগড়াটে), মি (পাকামি, জেঠামি), মন (কেমন, জেমন), হিন্দী ও বাঙলা, করণ ও

---

* আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, আধুনিক শিক্ষার আলো আসার পরও গ্রামীণ পরিবারগুলিতে কৃষিকাজ ও ফসল ওঠা নিয়ে, শিশুজন্ম নিয়ে, একাধিক ষষ্ঠী পূজা নিয়ে, এখানে শিকারের সঙ্গে পৌষ পার্বণ, শেয়াল শকুনির ব্রত ব্যাঘ্র দেবতার পূজা এবং চড়ক, গাজন ও বৃক্ষতলশায়ী নানান উপদেবতার পর্বানুষ্ঠান ও ব্রতপালন চলত।

অধিকরণে আর্যগোত্রের 'এ' ছাড়া 'তে' এর ব্যবহার ওড়িয়া সপ্তমীর 'রে' বিভক্তি (পুরীরে, রথরে), বাঙলার সাথে, লগে, লাগিয়া, খন (করবো'খন), থেকে প্রভৃতি সহায়ক শব্দের ব্যবহার, ক্রিয়াপদ নির্দেশ করতে 'আ' যোগ (কর্—করা, চল্—চলা) এসব ওদেরই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের নেওয়া। তা ছাড়া দেখতে গেলে আমাদের বাগ্‌ভঙ্গিমাটাই তো অনার্যগোত্রের। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বিশেষণাদি এবং সম্পূরক শব্দ ও বাক্যাংশ বাক্যের কোথায় কোথায় বসবে তার মোটামুটি একটা নিয়ম, যা সংস্কৃত-প্রাকৃতে ছিল না সে বিষয়ে ওদেরই সংস্পর্শে আমরা চালিত হয়েছি আমাদের ভাষার প্রাচীন আমল থেকে। শব্দের ও শব্দগুচ্ছের বাঙলা উচ্চারণে আদিতে শ্বাসাঘাত, শ্বাসাঘাত-প্রধান ছড়ার ছন্দ, প্রশ্নবাক্যের শেষাংশে শ্বাসাঘাত রীতি সাঁওতাল অর্থাৎ কোলমুণ্ডা সংসর্গেরই পরিচয়বাহী। অন্য পক্ষে দেখা যায়, সাঁওতালেরাও কর্মব্যপদেশে আমাদের সঙ্গী হয়ে যেমন কিছু কিছু বস্তু ও ব্যাপার তেমনি বেশ কিছু ভাব সম্পর্কও সংস্কৃত-প্রাকৃতের কাল থেকে আজ পর্যন্ত অর্জন ক'রে চলেছেন। সাঁওতালী শব্দভাণ্ডারে আরবী ফারসী শব্দও বেশ কিছু পাওয়া যাচ্ছে, পোর্তুগীজ বা ইংরেজিও দু'দশটা। আরবী-ফারসী শব্দগুলি সম্ভবতঃ তারা হিন্দী বাঙলার মধ্যস্থতাতেই নিয়েছে, তবু মনে হয়, কর্মসূত্রে তাদের সঙ্গে তুর্কি-পাঠানদেরও যোগাযোগ ছিল, কারণ, দেখা যায়, আরবী-ফারসী শব্দের মূল উচ্চারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বদলে ফেলেছি, কিন্তু ওদের ভাষায় তা বহুলাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

সংস্কৃত প্রাকৃত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলা ভাষার বিকাশের মূল সূত্রগুলি অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করে সদ্‌গুরু সুনীতিকুমার জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কেবল সূত্র নির্ণয়ই নয়, উপাদান সংগ্রহও তাঁর আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর আলোচনার নানান্ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বহু শব্দই তাঁকে সঞ্চয়ন করতে হয়েছে, আর্যভাষায় অথবা আরবী ফারসীতে যেগুলির হদিস তিনি পান নি। এরকম শব্দগুলিকে সম্ভাব্য অনার্য বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তাঁর গবেষণা ও গ্রন্থরচনার কালে সাঁওতালী ভাষা নিয়ে তেমন চর্চা হয়নি এবং উল্লেখ্য সাঁওতালী অভিধানও প্রণীত হয়নি। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি এবিষয়ে জানাশোনার পর লিখনে ও ভাষণে বাঙলার উপর সাঁওতালীর প্রভাবের বিষয় স্বীকার করেছেন। প্রকাশিতব্য বৃহদাকার অভিধানে আমি তাঁর অপূর্ণ অভিলাষ কিছুটা পূর্ণ করার প্রয়াস করেছি মাত্র।

ক্ষুদিরাম দাস / কোলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

ডঃ দাসের জন্ম বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে, বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৬, ৯ অক্টোবর)। তিনি প্রয়াত হন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ২০০২ সালের ২৮ এপ্রিল। পিতা সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনীবালা। গ্রামের মধ্য-ইং বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বাঁকুড়া জিলা স্কুলে চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের আদ্য, ও পুরাণ পরিষদের মধ্য পাস করেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে ইন্টার ও বি এ পড়েন। ১৯৩৭-এ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা পাস করেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্লা প'ড়ে ১৯৩৯ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণপদক সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন পরীক্ষায় পাস। অপরিসীম দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়।

এম-এ পাস করার পর বি-টি পাস ক'রে ইনি প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শকের কাজ নিয়ে কাল্না ও খানাকুলে বৎসর খানেক কাটিয়ে এবং ক'লকাতায় দু' একটি স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে স্কটিশ চার্চ কলেজে দু' মাস, সিটি কমার্সে চার-পাঁচ মাস এবং উইমেন্স্ কলেজে তিন বৎসর মত অধ্যাপনা করেন। এরপর শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রথম -নমিনেশন পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে। প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে দশ বৎসর কাজ ক'রে (মাঝে দেড় মাস কোচবিহার কলেজ) ১৯৫৫ আগষ্ট মাসে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্লি হন ।সেখান থেকে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ছ'মাসের জন্য হুগলী কলেজে কাজ করেন।তারপর ১৯৭৩ ১লা সেপ্টেম্বর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে ।সেই পদে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কাজ করার পর অবসর নেন। অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে তুলনামূলক অভিধান রচনার দায়িত্ব দেয়।কঠিন পরিশ্রম করে ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৬ সালে তিনি সেই অভিধান রচনা সমাপ্ত করেন।কেন সেই অভিধান আজও আলোর মুখ দেখল না সেটাই প্রশ্ন রয়ে গেল। আজ ডঃ দাস নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানের কাজ সেই পান্ডুলিপি নিশ্চয়ই সরকারি কোনও স্থানে হেফাজৎ আছে।আমরা আশাবাদী। আগামী দিনে হয়তো কোনও উদার, মহানুভব, চিন্তাশীল, ডঃ দাসের কাজটা যাতে আলোর মুখ দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইনি

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সদস্য, বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহী সদস্য, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ও অনেক কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।এ'র লেখা গ্রন্থসমূহ হ'ল,যথাক্রমে (১)রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (২)বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (৩)চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (৪) বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) সম্পাদনা- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। (৮)বানান বানানোর বন্দরে (৯)১৪০০ সাল ও চলমান রবি (১০)দেশ কাল সাহিত্য (১১)বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য (১২) ব্যাকরণ (তিন খণ্ড) (১৩) সাঁওতালী বাঙলা সম শব্দ অভিধান (১৪)বাছাই প্রবন্ধ এ-ছাড়া রয়েছে নানান্ পত্রিকায় ছড়ানো অগণিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দাসকে বাঙ্লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি দ্বারা (১৯৬২) সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটির জন্য 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' (শ্রেষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ সালে),গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার', ১৯৮৭ সালে হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি, ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক, ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত 'রবীন্দ্র তত্ত্বচার্য' উপাধি, চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি গ্রন্থটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান ১৯৯৪ সালে, ১৯৯৫ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার', ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'রবিতীর্থংকর' উপাধি।

Initiative By

All the content here is the property of Professor Khudiram Das' Family and hence any use of the contents without the prior permission, shall and will be of legal consequences.

Designed By

azways

http://azways.in/

Email: info@professorkhudiraamdas.com

Call: 9831895614

Web: http://professorkhudiramdas.com/